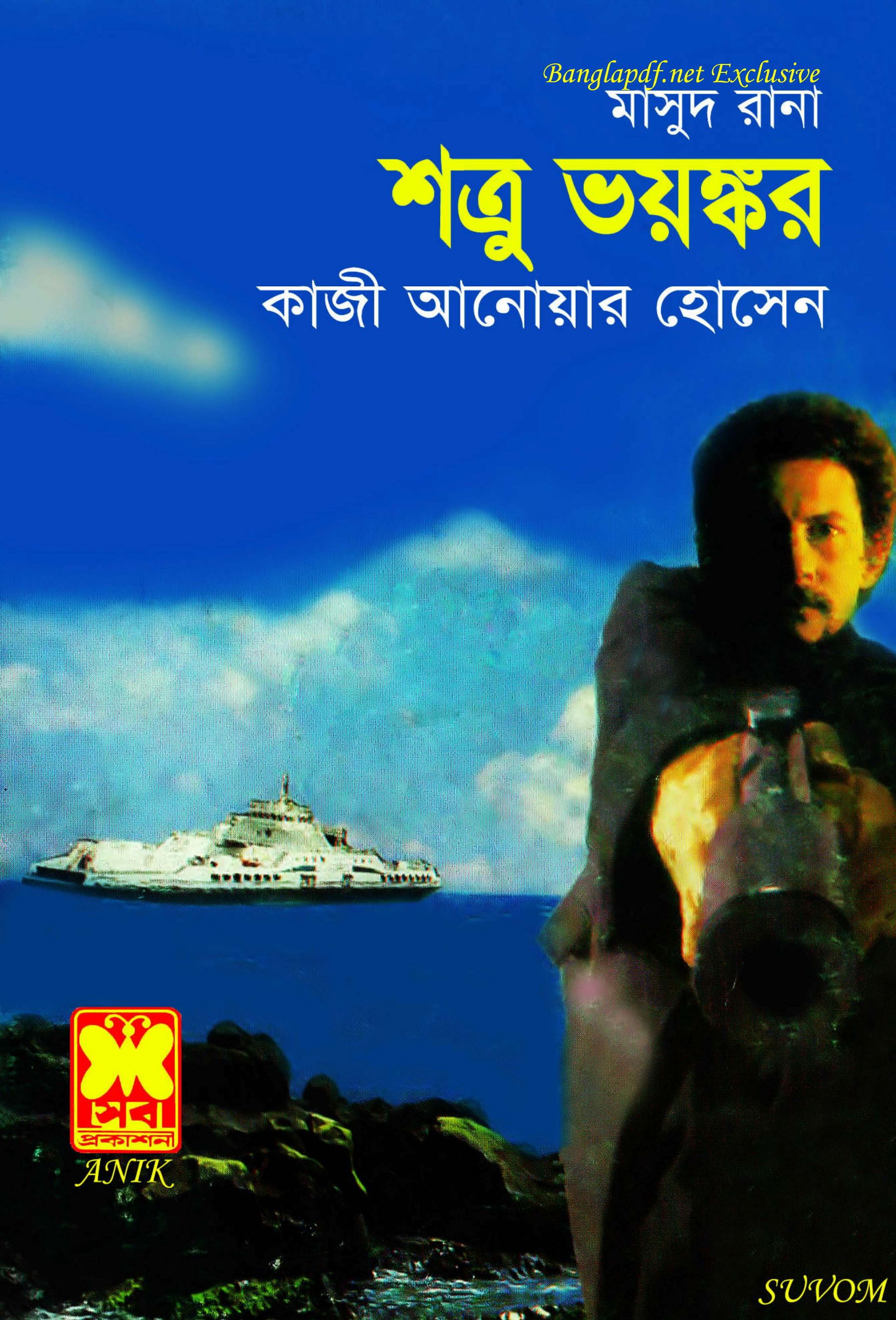

Banglapdf.net Exclusive
মাসুদ রানা
শত্রু ভয়ঙ্কর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
SUVOM

মাসুদ রানা

শত্রু ভয়ঙ্কর

কাজী আনোয়ার হোসেন

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রানা।
ইস্তাম্বুলের সাধারণ বিচারকক্ষে বিচার হচ্ছে ওর।
খুনের আসামী সে।
RCD শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের প্রথম জাহাজ
এম. ভি. রুস্তম এবং রাশিয়ার নব আবিষ্কৃত আণবিক
অস্ত্র Lenin M-315কে ঘিরে সৃষ্টি হলো এক ভয়ঙ্কর
ঘটনাচক্রের আবর্ত। তুফান উঠল ভূমধ্যসাগরে।
রাশিয়ার KGB-এজেন্ট কর্নেল নিকিতা ম্যাখারভ, ইস্তাম্বুলের
মাফিয়া-চীফ ইয়াকুব বে এবং পাকিস্তান কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা জড়িয়ে পড়ল
এক প্রচণ্ড প্রাণঘাতী সংঘর্ষে।
কে জয়ী হবে কে জানে!

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৭

শত্রু ভয়ঙ্কর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7007-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana 7
SHOTRU BHAYONGKAR
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সাতাশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক *কায়রো *মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন

এক

আসামীর কাঠগড়ায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমান মাসুদ রানা। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে সে। চারদিকে চাইল একবার ঘাড় ফিরিয়ে।

ইস্তাম্বুলের একটি বিচার কক্ষ। ডায়াসের ওপর একটা মাঝারি সাইজের মেহগনি কাঠের টেবিল, তার ওপাশে গদি আঁটা চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসেছেন বৃদ্ধ জজ। সনাতন জজ-সাহেবী চেহারা। কপালে গালে বার্ধক্যের ভাঁজ। কাঁচা-পাকা জুলফির ওপর চেপে বসে আছে পুরু বাইফোকাল লেন্সের চশমার হ্যাণ্ডেল। টাকের মাঝ বরাবর কাশ ফুলের মত একগুচ্ছ পাকা চুল দুলছে ফ্যানের হাওয়ায়। টাকের রঙটা লালচে। অনেকটা বেদানার মত।

বেশ বড়সড় বিচার কক্ষটি। জানালার সিক গলে বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে ঢুকছে ভেতরে। চল্লিশ-পঞ্চাশজন বিশিষ্ট নাগরিক ছাড়াও আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে আগত জনাকয়েক জার্নালিস্ট, ফটোগ্রাফার, এমব্যাসির কয়েকজন উৎসাহী কর্মচারী এবং চার-পাঁচজন সুন্দরী তরুণী। আজকের বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—তাই এই ভিড়। কাঠগড়া আর জজের মাঝামাঝি জায়গায় দুই সারি চেয়ারে বসেছে দর্শকবৃন্দ। জজের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে খাকি ইউনিফরম পরা ফেল্ট হ্যাট মাথায় পুলিস কমিশনার। ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কয়েকজন পুলিস কনেস্টবল।

বিচার হচ্ছে রানার। খুনের অপরাধে ধরা পড়েছে সে ইস্তাম্বুলে। পঞ্চাশ-ষাট জোড়া অপরিচিত চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই কঠোর অভিব্যক্তি। ফাঁসীর আসামীকে এ ছাড়া আর অন্য কি দৃষ্টিতে দেখবে মানুষ? খুবই অস্বস্তি বোধ করছে রানা।

দশ হাত তফাতে কোর্ট-রুমের প্রকাণ্ড দরজা। একটাই পথ। দু'জন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণী মৃদু হেসে কি যেন বলল বান্ধবীর কানে কানে। সারা ঘর ঘুরে এসে রানার দৃষ্টিটা আবার থমকে দাঁড়াল বৃদ্ধ জজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মুখের ওপর। চশমার পুরু কাঁচের ওপাশে এক জোড়া চোখ এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল ওকে। জজের পেছনে

দেয়ালে টাঙানো পৌরাণিক কালের একটা অলসঙ্গ দেয়াল-ঘড়ি। বিকেল চারটে বেজে পাঁচ। টিক্ টিক্ করে আরও পনেরো সেকেণ্ড পার হয়ে গেল।' তারপর আবার গমগম করে উঠল জজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'প্রশ্নের উত্তর দাও, মাসুদ রানা।'

'এককথা কতবার বলব? আমার নাম মাসুদ রানা নয়। আর পাসপোর্ট আমার চুরি হয়ে গেছে।'

'ধরা পড়বার সময় যে পিস্তল দিয়ে একজন পুলিসকে গুলি করে মারাত্মক জখম করেছ সেটার লাইসেন্স? আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে হলে লাইসেন্স দরকার হয়—কোথায় সেটা? সেটাও কি চুরি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তোমার এক্সপায়ার্ড ডেটেড্ পাসপোর্ট এবং লাইসেন্স এখন আমার টেবিলের ওপর আছে—এর থেকেই তোমার সত্যিকার নাম জানা গেছে। এ ব্যাপারে আর সময় নষ্ট না করাই ভাল।' টেবিলের ওপর থেকে রানার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে খুলে ধরলেন বৃদ্ধ জজ। পরিষ্কার রানার ছবি দেখা যাচ্ছে।

'বলো ইস্তাম্বুলে কেন এসেছিলে?'

বোকা বনে গেল রানা। কি উত্তর দেবে? ওর সম্পর্কে সব কিছুই জানে জজ সাহেব। মিথ্যে কথা বাড়িয়ে কোনও ফল হবে না। তবু কিছু একটা বলতেই হবে।

'বেড়াতে। ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছি আমি ইস্তাম্বুলে।'

'একজন ট্যুরিস্টের পরপর দু'জন কাস্টমস্ অফিসারকে খুন করবার দরকার পড়ে না। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোরও দরকার পড়ে না। তুমি মনে করেছিলে, ইস্তাম্বুলে তোমার গতিবিধি কাকপক্ষীও টের পাচ্ছে না—আসলে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ তোমার প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করেছে। যার কাছে তোমার দেশ থেকে স্মাগ্‌ল্ করে আনা বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের ডায়মণ্ড, রুবি আর এমারেল্ড জমা দিয়েছিলে, শুনে সুখী হবে যে সে-ও এতক্ষণে আমাদের সুদক্ষ পুলিসের হাতে বন্দী হয়েছে। কিন্তু না, তোমার কথাগুলো আমিই বলে দিচ্ছি— আসলে তোমার মুখেই শুনতে চাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা।'

'আপনারা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। আমি নিরপরাধ।'

'আমি এবারও দুঃখ প্রকাশ করছি। তোমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানাবার অনুরোধ করে আমরা তোমার সরকারকে তার করেছিলাম। উত্তর এসে গেছে। খবরটা শুভ নয়, যদি শুনতে চাও পড়ে শোনাতে পারি।'

রানা কোনও জবাব দিল না। টেবিলের ওপর থেকে একটা পেট মোটা খাম তুললেন জজ সাহেব, ভেতর থেকে বেরোল কয়েকটা কাগজ এবং গোটা কতক ফটোগ্রাফ। প্রথমেই ছবিগুলো নিজে পরীক্ষা করে নিয়ে রানার দিকে ফেরালেন তিনি সেগুলো তাসের মত করে ধরে।

'কি, চিনতে পারছ?'

ঘরের প্রতিটা লোক দেখল, ছবির চেহারা এবং কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর চেহারা এক ও অভিন্ন। দমে গেছে রানা। ঘরের প্রত্যেকে বুঝল এবার আর নিস্তার নেই রানার। কাগজে না জানি কি আছে! ওইসব প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে আসামীর।

কাগজগুলোর ভাঁজ খুলে প্রথমে পৃষ্ঠাগুলো ঠিক পরপর আছে কিনা দেখে নিলেন জজ সাহেব নম্বর গুণে। তারপর পড়তে আরম্ভ করলেন গম্ভীর কণ্ঠে।

'মাসুদ রানা; পিতা—পরলোকগত জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরী, জন্ম—ঢাকা, ১৯— সালের ৯ এপ্রিল। শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি. এ.। অবিবাহিত। ১৯— সালে আর্মির কমিশনড্ র‍্যাঙ্কে প্রবেশ করে ১৯— সালেই মেজর র‍্যাঙ্কে উন্নীত হয়। তার অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে আর্মি ইন্টেলিজেন্সে নিয়ে আসা হয় ১৯— সালে। ১৯— সালে সেখান থেকে সরিয়ে তাকে নিয়োগ করা হয় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। অদ্ভুত দুঃসাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে দেশে-বিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯— পর্যন্ত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করবার পর হঠাৎ কুসংসর্গে পড়ে খারাপ পথে চলতে আরম্ভ করে। একটা চোরা-চালানকারী দলকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবার অপরাধে চাকরি যায়, সামান্য কিছু ফাইনও হয়। ১৯— সালের প্রথম দিকে হাতে-নাতে ধরা পড়ে স্মাগলিং-এর দায়ে, কিন্তু তিনজন পুলিসকে খুন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর বার্মার এক ভয়ঙ্কর দস্যু উ সেনের দলে যোগদান করে ডায়মণ্ড, রুবি ইত্যাদি মহামূল্যবান পাথর-কাটিং এবং চমৎকার নকল পাথর তৈরি করা শেখে। গত মার্চ মাসে উ সেনকে খুন করে বহুমূল্য কিছু পাথর ও যন্ত্রপাতি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এর সম্বন্ধে কোনও খবর দিতে পারলে পাকিস্তান সরকার উপকৃত হবে।'

মুখ তুললেন জজ সাহেব কাগজ থেকে। মৃদু হাসলেন রানার দিকে চেয়ে। 'আর এই কাগজটায় আছে মাসুদ রানার বুড়ো আঙুলের ছাপ। দুঃখের বিষয়, ছাপটা তোমার থাম-ইম্প্রেশনের সাথে অবিকল মিলে গেছে বলে আমাদের স্পেশালিস্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন...' কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখলেন তিনি খামের মধ্যে, 'তোমাকে তোমার দেশে ফেরত পাঠাতে

পারলে আমরা খুবই খুশি হতাম, কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তুরস্কের নাগরিককে খুন করার দায়ে এখানেই তোমার বিচার এবং শাস্তি হবে। এইসব প্রমাণের বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?'

'পানি! একগ্লাস পানি!' শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু জিভও বোধহয় শুকিয়ে গেছে। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কেমন যেন রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। আঙুলগুলো কাঠগড়ার রেলিং-এর ওপর চেপে বসায় নখগুলো অস্বাভাবিক সাদা। দ্রুত শ্বাস পড়ছে ওর।

সবাই মনোযোগ দিয়ে জজের কথাগুলো শুনছিল। এই আবছা ফ্যাঁশফেঁশে কণ্ঠস্বর কানে যেতে সবাই একসাথে চমকে ফিরল ওর দিকে। জজের চোখের কঠিন দৃষ্টিটা একটু উদ্বিগ্ন দেখাল।

'কোর্ট-রুমে পানি কোথায়? আর বেশি দেরি নেই—বিশ মিনিটের মধ্যে নিজের সেলে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে। মনে রেখো, চুপ করে থাকা মানেই অপরাধ স্বীকার করে নেয়া। তোমার কি কিছুই বলবার নেই, যুবক?'

এত কথা কানে গেল না রানার। টলছে এখন সে। থরথর করে কাঁপছে রেলিং ধরা দুই হাত। এক্ষুণি ঢলে পড়ে যাবে মাটিতে। কপালে উঠেছে চোখ জোড়া, সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে কেবল। হাত চারেক পেছনে হ্যান্ডকাফ হাতে নিয়ে দাঁড়ানো প্রহরীটা দ্রুত এগিয়ে এল ওর দিকে।

'পানি! পানি!' আবার বলল রানা ফিসফিস করে। প্রহরীর পিছন দিকে দেখাল আঙুল দিয়ে, 'ওই যে কলস।'

অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল প্রহরী, এবং পর মুহূর্তে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। প্রচণ্ড বেগে মারল রানা লোকটাকে। একটানে ওর কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে নিয়ে আবার একটা নক্ আউট পাঞ্চ কষাল প্রহরীর নাক বরাবর। ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল লোকটা। জোরে ঠুকে গেল মাথা। কাঠের পুতুলের মত আছড়ে পড়ল ওর জ্ঞানহীন দেহ।

ব্যাপারটা এতই দ্রুত ও আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেল কোর্ট-রুমের এতগুলো লোক। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীর এই আচরণ কেবল অবিশ্বাস্য নয়, অসম্ভব। ঘোরটা কেটে যেতেই নড়ে উঠল কয়েকজন প্রহরী। রানার হাতের রিভলভার এখন সোজা জজের বুকের দিকে ধরা।

'খবরদার! নিষেধ করুন ওদের! নইলে এক্ষুণি পরপারে পাঠিয়ে দেব! কেউ আর এক পা এগোলেই গুলি করব আমি!'

জজকে কিছু বলতে হলো না। রানার দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে যে যেখানে

ছিল স্থির হয়ে গেল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। রিভলভারের মুখটা জজের দিক থেকে না সরিয়ে রানা এবার প্রহরীদের আদেশ দিল।

'সবাই সরে চলে যাও ঘরের মাঝখানে। সাবধান! কেউ কোমরে হাত দিয়েছ কি খুন হয়ে যাবে। কোনও চালাকি চাই না, আমি বেপরোয়া লোক।'

সবাই চলে এল ঘরের মাঝ বরাবর। হঠাৎ কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ জজ।

'তুমি এইভাবে নিস্তার পেয়ে যাবে মনে করেছ, যুবক? তোমার মত বুদ্ধিমান লোক যে এত বড় বোকামি করে বসবে তা ভাবতে পারিনি। এভাবে ভয় দেখিয়ে কোর্ট-রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়া যদি সম্ভব হয়ও, পনেরো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়বে তুমি পুলিশের হাতে। টার্কির পুলিস বিভাগকে তুমি চেন না। এবং এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

'ছোঃ!' বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল রানার মুখে। 'হাওয়ায় মিলিয়ে যাব আমি। আপনাদের যত বড় ছাগলের দল থাকুক না কেন, কিছুই করতে পারবে না আমার। বাইরে দুটো গাড়ি দাঁড়ানো আছে। আপনারটা বিকল করে দিয়ে কমিশনারের গাড়িতে চলে যাব আমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

'মূর্খ! তুমি দশ মাইল যাবার আগেই সারা টার্কিতে খবর ছড়িয়ে পড়বে। হাজার হাজার লোকের অনুসন্ধিৎসু চোখের সামনে দিয়ে পালাবে কি করে তুমি?'

'সেটা আগে থেকে আপনাকে বলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কিন্তু জেনে রাখবেন, পালাবোই আমি।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল রানার। 'পুলিস কমিশনারকে সাবধান করুন, নইলে...'

আর কথা বলবার সময় নেই। গর্জে উঠল রানার হাতের রিভলভার। বন্ধ ঘরের মধ্যে গুলির প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল সবাই। তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে সঙ্গিনীর গায়ের ওপর ঢলে পড়ল এক মহিলা।

পিস্তল বের করে ফেলেছিলেন পুলিস কমিশনার। খটাং করে পড়ে গেল সেটা সিমেন্টের মেঝের ওপর। ডান কব্জিটা চেপে ধরলেন কমিশনার বাম হাত দিয়ে। টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত ঝরছে বাম হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে। দুই চোখে তাঁর গোক্ষুরের বিষ। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন রানার চোখের দিকে।

হঠাৎ খেপে গেল একজন প্রহরী, ছুটে এগোল সে রানার দিকে। আবার গর্জে উঠল রানার হাতের রিভলভার। যেন কেউ লাঠির বাড়ি মারল প্রহরীর উরুর ওপর। পড়ে গেল সে মাটিতে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। চেপে ধরল সে গুলিবিদ্ধ জায়গাটা। লাল হয়ে উঠল প্যান্টের খাকি

কাপড়।

'কাজেই সাবধান!' এতক্ষণে আবার কথা বলল রানা। 'আর কেউ বীরত্ব প্রদর্শন করতে চাইলে এগোও। এবার আর হাত-পায়ে মারব না, খুলি বরাবর গুলি চালাব।' হলঘরের ভীত-সন্ত্রস্ত লোকগুলোর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল রানা একবার। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সবাই। এবার হঠাৎ রিভলভার ধরল সে বেগুনী স্কার্ট পরা নীল-নয়না সুন্দরীর দিকে। 'এই যে, সুন্দরী, উঠে দাঁড়াও চেয়ার ছেড়ে।'

অবাক চোখে রানার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, যেন বুঝতেই পারেনি রানার কথা।

'কই, উঠে এসো আমার কাছে।' রিভলভার দুলিয়ে ইঙ্গিত করল রানা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চাইল একবার সে রিভলভারের দিকে। তারপর উঠে এল সীট ছেড়ে আড়ষ্ট পায়ে।

'ভয় নেই, খেয়ে ফেলব না। তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার দেহরক্ষী হিসেবে। যাতে গুলি করে গাড়ির চাকা ফাটাবার আগে মাথামোটা পুলিসগুলো একটু ভাবনা-চিন্তা করে, সেজন্যে সাথে নিয়ে যাব আমি তোমাকে।' এবার ফিরল সে আবার জজের দিকে। 'আমরা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি কেউ এই দরজা দিয়ে বেরোয় তাহলে তার নিজ দায়িত্বে বেরোবে। আমার চোখে পড়লেই গুলি করব। আচ্ছা, বাই বাই!'

সাবধানে নেমে এল রানা কাঠগড়া থেকে। রিভলভারের মুখটা একবার দর্শকের ওপর বুলিয়ে নিয়ে মেয়েটিকে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড় করাল। কোনও রকম কৌশল যেন না করতে পারে সেজন্যে পিছন থেকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরল সে মেয়েটিকে। দর্শকমণ্ডলীর চোখে নগ্ন বিস্ময়।

'একপা একপা করে পিছিয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

দরজার কাছে চলে গেল ওরা। একবার হাত নেড়ে টা-টা করল রানা সবাইকে। প্রকাণ্ড কপাট দুটো বন্ধ করে বাইরে থেকে বল্টু লাগিয়ে দিল।

দুই

জজ সাহেবের একটা পুরানো মডেলের পন্টিয়াক গাড়ি পার্ক করা আছে কমিশনারের থ্রী হানড্রেড মডেল মার্সিডিস গাড়ির পাশে। টার্কি-পুলিসের

বেশিরভাগ গাড়িই মার্সিডিস।

ড্রাইভার বসে বসে ঝিমোচ্ছে কমিশনারের গাড়ির মধ্যে। খাকি ইউনিফরম পরা।

টাকসিম স্কোয়্যারের এই রাস্তাটা প্রায় জনশূন্য। দুই-একজন পথচারী আর এক-আধজন সাইকেল আরোহী।

প্রথমেই পন্টিয়াকের সামনের একটা চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা। নিচু হয়ে বসে গেল চাকাটা। থমকে দাঁড়াল রাস্তার ওপর কয়েকজন পথচারী। ওদের চোখের সামনে দিয়ে হাত ধরে টেনে আনল রানা মেয়েটিকে মার্সিডিস গাড়ির পাশে, কিন্তু যে যেমন ছিল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল, সাহায্য করতে এগিয়ে এল না কেউ।

গুলির শব্দে ঢুলুনির ঘোরটা কেটে গেছে ড্রাইভারের—অবাক চোখে সে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। ওকে এই গাড়ির দিকে এগোতে দেখে তটস্থ হয়ে উঠল সে। কি করবে বুঝতে পারছে না। এপাশ-ওপাশ চাইল সে একবার।

'নেমে পড়ো, বাছা।' সোজা ড্রাইভারের কপালের দিকে রিভলভার ধরে মোলায়েম কণ্ঠে বলল রানা।

আতঙ্কে ড্রাইভারের চোখ এবার কপালে উঠল।

রানাই খুলে দিল দরজাটা। ইগনিশান্ কী-টা খুলে নিতে যাচ্ছিল সে, রানা বলল, 'উঁহু! ওটা যেখানে আছে সেখানেই থাক্।'

ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার গাড়ি থেকে। দশ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছে সে রানার কার্যকলাপ। মেয়েটিকে পাশের সীটে উঠিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল রানা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা কোর্টের সামনে দিয়ে। টাকসিম স্কোয়্যার ছাড়িয়ে গাড়ি গিয়ে পড়ল জনাকীর্ণ ইস্তিকলালে। তারপর এশিয়া ছেড়ে ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় ভাগের দিকে চলল ওরা গালাটা ব্রিজের ওপর দিয়ে। কয়েকটা নোঙর ফেলা বণিক-জাহাজ আর স্টীমার দাঁড়িয়ে থাকায় গালাটা ব্রিজের শেষপ্রান্ত চোখে পড়ছে না। আধ মাইল লম্বা ব্রিজটা পার হয়ে এল ওরা অসংখ্য বাইসাইকেল আর ট্রামকে ওভারটেক করে। হর্ন দিলেও নড়তে চায় না সাইকেল আরোহীরা রাস্তার মাঝখান থেকে, এতই স্বাধীনচেতা এদেশের নাগরিক।

ব্রিজটা পার হতেই অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা পাওয়া গেল। ইউরোপে চলে এসেছে ওরা এখন। মিনার আর গম্বুজওয়ালা অসংখ্য মসজিদ চোখে পড়ল রানার। পিছনে চেয়ে পেরার পাহাড়ের মাথায় মস্ত হোটেল ইস্তাম্বুল-হিল্টন দেখতে পেল সে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝলমল করছে।

বারো মাইল যাওয়ার পর প্রথম বাধা পেল রানা। কিছুক্ষণ আগেই পিছনে

সাইরেন শুনতে পেয়েছে সে। এগিয়ে আসছে একটা পুলিসের গাড়ি। রানা খুব বেশি স্পীড দিতে পারছে না, কারণ রাস্তা-ঘাট ওর সম্পূর্ণ অচেনা। কোথায় বাঁক, কোথায় ভিড়, কোথায় ফাঁকা পথ, কিছুই জানা নেই ওর। শুধু মোটামুটি ধারণা আছে বুলগেরিয়ার দিকে এগোচ্ছে সে। আর পুলিসের গাড়ির ড্রাইভারের সমস্ত রাস্তা-ঘাট মুখস্থ। ক্রমেই দূরত্ব কমছে দুটো গাড়ির। কিন্তু রানা এজন্যে মোটেই চিন্তিত নয়, নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে এগোচ্ছে সে। হঠাৎ ব্রেক করল।

একটা বাঁক ঘুরেই দেখা গেল দু'শো গজ দূরে একটা পেট্রল পাম্প থেকে কয়েকটা বড় বড় পেট্রলের ড্রাম নিয়ে রাস্তার ওপর সাজানো হয়েছে। রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে অভ্যর্থনাটা ওরই জন্যে। রাস্তা বন্ধ। খুব সম্ভব টেলিফোনে খবর পেয়েই রাস্তার ওপর ড্রাম রেখে রানার গতিরোধ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রিয়ার ভিউ মিরারে চেয়ে দেখল রানা, দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা কালো মার্সিডিস কনভার্টিবল্। গাড়ির আরোহীদের পরনে খাকি পোশাক। আবার ব্রেক কষে তিরিশে নিয়ে এল স্পীড। বিপজ্জনক হলেও চেষ্টা করে দেখতে হবে।

সোজাসুজি ড্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে রানা। আড়চোখে দেখল ডান পা-টা একটু বাঁয়ে সরিয়ে কাল্পনিক ব্রেক কষছে মেয়েটা নিজের অজান্তেই—পা-টা টিপে ধরেছে গাড়ির মেঝেতে। ধাক্কা খাওয়ার আগের মুহূর্তে চোখ বুজে দুই হাতে মুখ ঢাকল সে। একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না রানা। মার্সিডিসের নাকটা সোজা গিয়ে গুঁতো মারল দুটো ড্রামের গায়ে।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা আশা করেছিল রানা। কিন্তু আশ্চর্য! ছিটকে সরে গেল ড্রাম দুটো। মৃদু হেসে সেকেণ্ড গিয়ারে দিয়ে অ্যাক্সিলারেটার পুরো টিপে ধরল রানা। পিছনে চেয়ে দেখল পুলিসের গাড়িটাও স্পীড কমিয়েছিল রানার দেখাদেখি, এবার আবার আসছে তেড়ে। থার্ড গিয়ারে দিল রানা।

'চোখ খোলো, সুন্দরী! বেঁচে আছ এখনও।' বাম হাতে মেয়েটির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা। তারপর আবার গিয়ার চেঞ্জ করল। আশি মাইল স্পীডে চলছে এখন ওরা।

চমকে চোখ মেলল মেয়েটি। সামনে পেছনে পেট্রলের ড্রামের চিহ্নও নেই দেখে বলল, 'ড্রামগুলো পেরোলে কি করে?'

'ধাক্কা দিতেই ছিটকে সরে গেছে রাস্তার ওপর থেকে। খালি ড্রাম ছিল ওগুলো।'

'খালি তুমি জানতে?'
'প্রায়।'
'প্রায় কি রকম?'
'এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো পেট্রল ভরা ড্রাম রাস্তার ওপর এনে সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই আন্দাজ করে নিলাম যে ওগুলো খালিই হবে, আস্তে ধাক্কা দিলে গাড়ির বিশেষ কোনও ক্ষতি না করেও সরিয়ে ফেলা যেতে পারে।'
'কিন্তু পেছনের পুলিসদের কি করে এড়াবে?'
'সেটাও দেখতে পাবে।'
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল, 'ভাল কথা, নামটা কি তোমার?'
'নাম দিয়ে কি করবে?'
'কি আর করব, ডাকব। যতক্ষণ একসাথে আছি কেবল "সুন্দরী" না বলে একটা কিছু নাম ধরে ডাকতে পারলে হত। তাই জিজ্ঞেস করছি।'
'যোহ্‌রা হাসান। সবাই যোরা বলেই ডাকে।'
'হাসানটা পিতার নামের অংশ, না স্বামীর?'
'বাবার। আমার বাবার নাম হাসান খলীল।' যোরা আশা করেছিল নামটা শুনলেই চিনতে পারবে রানা। কিন্তু রানার মুখের দিকে চেয়েই বোঝা গেল নামটার সাথে পরিচিত নয় সে মোটেই। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। বিদেশী একজন লোকের পক্ষে তার স্বনামধন্য কোটিপতি পিতাকে চিনতে না পারা আশ্চর্যের কিছু নয়।
সামনে রাস্তাটার কয়েকটা বিপজ্জনক বাঁক আছে—একটা বোর্ডে বিপদসঙ্কেত দেখে বোঝা গেল। স্পীড কমাতে বাধ্য হলো রানা। কতখানি বিপজ্জনক, কত স্পীডে গেলে ঠিক হবে বুঝবার উপায় নেই—স্পীড লিমিট লেখা নেই কোথাও। চল্লিশের ঘরে চলে এল মাইল-মিটারের কাঁটা। সাথে সাথেই পিছন থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ পাওয়া গেল। এতক্ষণে রেঞ্জের মধ্যে পেয়েছে ওরা রানাকে।
'নেমে পড়ো। সীট থেকে নেমে পড়ো, যোরা! শালারা গুলি আরম্ভ করেছে। নিচে বসে সীটের ওপর মুখ গুঁজে রাখো।'
চট্ করে বসে পড়ল যোরা। রানা ওর মাথাটা আরও গুঁজে দিল সীটের ওপর। তারপর পিছন ফিরে চাইল একবার। রিভলভার বের করে ফেলেছে সে। সামনে থাকার যে সুবিধা, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে সে এখন। পাকা রাস্তা ছেড়ে কিছুক্ষণ রাস্তার পাশে ধুলোর ওপর দিয়ে চলল সে। যখন আবার পাকা রাস্তায় উঠে এল তখন পেছনটা অন্ধকার হয়ে গেছে একরাশ ধুলোয়।

দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে স্পীড কমাতে বাধ্য হলো পশ্চাদ্ধাবনকারী, কিন্তু গুলি বন্ধ করল না। ঠুস করে পেছনের উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে ঢুকে সামনের উইন্ডস্ক্রীন ফুটো করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। একরাশ কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল গাড়ির ভিতর।

রাস্তার ওপর থেকে ধুলো সরে যেতেই রানা দেখল ঠিক পনেরো গজ পিছনে পুলিসের গাড়িটা। মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করছে ওরা। কিন্তু চাকায় গুলি করতে সাহস পাচ্ছে না—তাহলে মেয়েটাও মারা পড়বে। ভয় দেখিয়ে ওই দুঃসাহসী লোকটাকে থামানো যাবে না, পরিষ্কার বুঝতে পারল ওরা। রানার মাথার সামান্য অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তার ওপর এঁকেবেঁকে চালাচ্ছে সে গাড়িটা। কিছুতেই ঘায়েল করা যাচ্ছে না। ওকে শেষ করতে পারলে যোরা হুইল কন্ট্রোল করে ব্রেক চেপে হয়তো প্রাণে রক্ষা পেতে পারে। এখন কোনমতে সামনে গিয়ে রাস্তা আটকে গাড়ি থামানো ছাড়া আর কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

যত্নের সঙ্গে প্রথম গুলিটা ছুঁড়ল রানা। বেঁকে গেল পিছনের গাড়ির একজনের দেহ। আর মাত্র দুটো গুলি আছে রানার রিভলভারে। পুলিসের গাড়িটা এবার ওভারটেক করে রানাকে আটকাবার মতলব করছে। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরাও।

রানার দ্বিতীয় গুলিটাও লক্ষ্যভেদ করল। হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল পিছনের গাড়িটার। ডানপাশে চলে গেল রাস্তার, খাদে পড়তে পড়তে আবার ফিরে এল রাস্তার মাঝখানে। এবার বাঁয়ে চলেছে। প্রাণপণে ব্রেক কষেছে ড্রাইভার, হুইলের সঙ্গে রীতিমত কুস্তি করছে সে এখন। রাস্তার ওপর চাকা ঘষার বিশ্রী তীক্ষ্ণ শব্দটা দূরে সরে গেল। শেষ পরিণতিটা আর দেখা গেল না। একটা ইউ-টার্ন নিয়ে ফুল-স্পীডে চলে গেল রানা সোজা রাস্তা ধরে। কয়েকটা দোকান-পাটের আড়ালে পড়ে গেল পুলিসের গাড়ি।

নিজের অজান্তেই মাথাটা উঁচু করে রানাকে লক্ষ করছে যোরা। বুঝল, রানার বিপদ কেটে গেছে। সপ্রশংস বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সে নিষ্ঠুর চেহারার ওই দুর্ধর্ষ বিদেশী লোকটার মুখের দিকে। অদ্ভুত দক্ষ দুঃসাহসী লোকটার মুখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। এমন একটা লোক নষ্ট হয়ে গিয়ে কুপথে চলেছে বলে কেন যেন খারাপ লাগল ওর। রানার বিপদ কেটে যাওয়া মানে যে নিজের বিপদ আরও ঘনীভূত হওয়া, সেকথা একবারও মনে এল না ওর।

রানা মৃদু হাসল ওর দিকে চেয়ে। বলল, 'এবার উঠে বসতে পারো। আর ভয় নেই।'

সত্যিই কেন যেন ভয় কেটে যাচ্ছে যোরার। যে লোক এত অদ্ভুত করে হাসতে পারে, সে কিছুতেই খারাপ হতে পারে না। মানুষের মুখ হচ্ছে তার মনের আয়না। নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল আছে—এর মধ্যে আরও কোনও ব্যাপার আছে। খুনী দস্যু যদি হবে তাহলে যোরার নিরাপত্তার দিকে এত তীক্ষ্ণ নজর কেন লোকটার? নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে ভয় কেটে যাচ্ছে যোরার। এতক্ষণের মধ্যে একটিও অশোভন উক্তি কিংবা বাজে ইঙ্গিত বা ব্যবহার করেনি লোকটা। এ কিছুতেই খারাপ লোক হতে পারে না।

চট্ করে যোরার মনে পড়ল কোর্ট-রূমের ঘটনাগুলো। দুই-দুইজন লোককে জখম করেছে রানা সেখানে। আত্মরক্ষার তাগিদে হোক আর যে-জন্যেই হোক, প্রয়োজন হলে লোকটা খুন করতে পারে। ওকেও কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে খুন করবে না তো!

'আমাকে নিয়ে কি করবে শেষ পর্যন্ত?' জিজ্ঞেস করল যোরা।

'শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা যায় না। আপাতত আগামী তিনদিন আমার কাছে থাকতে হবে তোমাকে। সেভাবে মনটাকে প্রস্তুত করে নাও। এদের হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে ছেড়ে দেব তোমাকে। আর এই তিনদিনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে যদি তোমাকে ভাল লেগে যায়, তাহলে ছাড়ব না আর কোনদিনই।'

'কিভাবে পালাবে তুমি?'

'সেটা দেখতেই পাবে। এখন রেডিওটা খোলো দেখি। আমাদের সম্বন্ধে কিছু বিশেষ ঘোষণা থাকতে পারে।'

গাড়ির লোকাল রেডিও সেটটা খুলতেই ভেসে এল মিষ্টি একটা টার্কিশ মিউজিক। ত্রয়ী যন্ত্র-সঙ্গীত। সুরের মধ্যে আরবী প্রভাব স্পষ্ট। হঠাৎ বাজনাটা বেরসিক রানার মনটাকেও টেনে নিয়ে গেল আরব্য উপন্যাসের সেই স্বপ্নিল জগতে। প্রশস্ত সমতল রাস্তার ওপর দিয়ে পক্ষীরাজের মত ভেসে চলল মার্সিডিস থ্রী হানড্রেড। আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে যোরা আয়ত নীল চোখ সামনের দিকে মেলে দিয়ে। মাথায় বাঁধা কালো স্কার্ফের পিছন দিকটা উড়ছে জোর বাতাসে। একগুচ্ছ কোঁকড়া চুল এসে পড়েছে গালের ওপর। মুক্তির উপায় চিন্তা করছে যোরা গভীর ভাবে। মৃদু হাসল রানা আপন মনে।

ঠিকই বলেছে রানা। বাজনা শেষ হতেই রেডিও ইস্তাম্বুল থেকে ঘোষণা শোনা গেল। রানা, যোরা এবং গাড়িটার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে পুলিস বিভাগ এবং দেশের সমগ্র জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে, যে-কোনও উপায়ে হোক ঠেকাতে হবে গাড়িটাকে। বুলগেরিয়ার দিকে চলেছে গাড়িটা। আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই হাতছাড়া হয়ে যাবে খুনী মাসুদ রানা। যে ধরে দিতে পারবে

তাকে দশ হাজার টার্কিশ পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে সরকারের তরফ থেকে।

একটানে যোরার মাথায় বাঁধা সিল্কের স্কার্ফটা খুলে আলোয়ানের মত করে জড়িয়ে ঢেকে দিল রানা যোরার বেগুনী রঙের টাইট-ফিট্ স্কার্ট। কুচকুচে কালো বব্ ছাঁটা চুল বেরিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে নাকে এল হালকা হেয়ার ক্রীমের সুগন্ধ।

নিজের টাইটাও খুলে পকেটে রেখে দিল মাসুদ রানা। রিভলভার দিয়ে ঠুকে ঠুকে উইন্ডস্ক্রীনটা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলল। হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে এখন ভিতরে।

'ওটা ভাঙলে কেন?'

'কারণ ফুটো হয়ে যাওয়া উইন্ডস্ক্রীন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওটা একেবারেই না থাকলে ভালমত লক্ষ করে না দেখলে সহজে বোঝা যাবে না আছে কি নেই।'

কথাটার যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না যোরা। চুপ করে রইল সে। হঠাৎ ব্রেক কষে থামাল রানা গাড়িটা একটা ঝোপের পাশে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল, কেউ নেই। যোরাকে গাড়িতেই বসে থাকতে আদেশ দিয়ে চলে গেল সে ঝোপের আড়ালে। নিজের সোয়েটারটা খুলে ফেলল সে ঝট্‌পট্। এক মিনিটের মধ্যেই স্যুটটা উল্টে পরল। গাঢ় নীল রঙের স্যুট মুহূর্তে উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্যুটে পরিণত হলো। বুক-কাটা সাদা সোয়েটার উল্টে ফেলতেই সেটা হয়ে গেল টকটকে লাল। সোয়েটারটা নিজে না পরে হাতে করে নিয়ে ফিরল সে গাড়িতে।

ঝোপের আড়াল থেকে অন্য এক মানুষকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল যোরা। ভাবল, আরও কত কৌশল লোকটার মাথায় আছে কে জানে!

'নাও, সোয়েটারটা কার্ডিগানের মত করে পরে ফেলো,' বলল রানা।

'লাল সোয়েটার আবার পেলে কোথায়?'

'আমারটাই। উল্টালে লাল হয়ে যায়।'

'কিন্তু বড় হবে তো আমার গায়ে।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না। লোকের চোখে ফাঁকি দিতে পারলেই হলো।'

সোয়েটারটা পরে ভালই দেখাচ্ছে যোরাকে। গলার কাছে একটা বোতাম কেবল লাগিয়েছে সে। লম্বাটা অতিরিক্ত মনে হচ্ছে না। একটু ঢোলা, এই যা।

'কিন্তু গাড়ির রঙ তো আর পাল্টাতে পারবে না! ধরা তোমাকে পড়তেই

হবে, মাসুদ রানা,' গাড়িটা আবার রওনা হতেই বলল যোরা।

রানা মৃদু হাসল শুধু। বেশ কিছুদূর নীরবে চলল ওরা। যোরার চোখে পড়ল সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল ওপেল রেকর্ড। বন-ভোজনে এসেছে কোনও ফ্যামিলি। তিন চারশো গজ দূরে একটা মোড় ঘুরল রানা। কয়েক গজ গিয়েই হঠাৎ ব্রেক করল। খানিকটা ব্যাক করে এসে একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির খোলা গ্যারেজের মধ্যে প্রবেশ করল সে গাড়িটা নিয়ে। সুইচ অফ করে দিয়ে যোরাকে নামবার ইঙ্গিত করল সে। বিস্মিত যোরা নামল গাড়ি থেকে।

'গাড়িটা এখানেই থাকবে। সামনের এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে ফিরে যাব আমরা যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে। সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবে। যদি চিৎকার করো, কিংবা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করো, তাহলে একদম শেষ করে দেব। আমার কোটের পকেটে রিভলভার সব সময় প্রস্তুত থাকবে তোমার জন্যে। এসো, আমার কোমর জড়িয়ে ধরো। আমরা জড়াজড়ি করে পথ চলব। লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছু নেই—এখানে কেউ চিনবে না তোমাকে।'

সত্যিই কেউ চিনল তো না-ই, লক্ষও করল না। ইউরোপীয় অঞ্চলের এটা একটা স্বাভাবিক দৃশ্য। একটা অল্পবয়সী ছোকরা বাইসাইকেলে করে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে সিটি দিল। বাপ-মা তুলে গাল দিল ওকে রানা। চলে গেল সে ছ্যাবলা হাসি হেসে।

রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ওপেল গাড়িটার কাছাকাছি এসেই বুঝতে পারল যোরা রানার উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। দুরু দুরু কেঁপে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

জিনিসপত্র গুছাচ্ছিল পিকনিকে আগত পরিবারটা। তিন-চারটে ছেলে-মেয়ে আছে, একজন বৃদ্ধা, মাঝ-বয়সী স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের এক পুরুষ বন্ধু। দড়াম করে অত্যন্ত জোরে দরজা লাগানোর শব্দে তাজ্জব হয়ে দেখল ওরা একটা মেয়ে উঠে বসেছে ওদের গাড়িতে। রানার গাড়িতে ওঠা টের পায়নি ওরা—সে আগেই উঠে বসে আছে। রানাকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল ওরা। সমস্বরে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে রাস্তার দিকে।

চাবি নিয়ে গিয়েছিল ওরা ঠিকই—কিন্তু স্টিয়ারিংটা লক করেনি। সিক্সটি-ফোর মডেলের সেভেন্টিন হানড্রেড ওপেল রেকর্ডের ইগনিশন সুইচটা ডান দিকে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। ওদের চোখের সামনে দিয়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল ওদেরই শখের গাড়ি। রানা হাত নেড়ে টা-টা করল ওদের।

'এদিকে কোথায় চললে?' অবাক হয়ে গেল যোরা। দেখল, যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে চলেছে মাসুদ রানা।

'ইস্তাম্বুল,' রানা হাসল যোরার দিকে চেয়ে। 'এখন একমাত্র এই দিকে গেলেই ধরা পড়া থেকে বাঁচা যাবে। কেউ ভাবতে পারবে না আমরা এদিকে যেতে পারি। ফিরে যাচ্ছি আমরা ইস্তাম্বুলে।'

অবাক হলেও মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল যোরা। ওখানে বহুলোকই চেনে ওকে। সেকথা এই বিদেশী দস্যুর জানবার কথা নয়। ইস্তাম্বুলে ফিরে গেলে কারও না কারও চোখে পড়ে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মনের মধ্যে। কিন্তু রানাকে বলল না সে কিছু। নিজের চেনা জায়গায় চেনা পরিবেশের মধ্যে উদ্ধারের কোনও না কোনও পথ বেরোবেই।

একটা পুলিসের গাড়ি আর গোটা কয়েক মোটর সাইকেল আসছে দ্রুতবেগে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা। একটা মোটর সাইকেল কি মনে করে আবার ফিরে এল। রানা এবং যোরাকে ভালমত দেখে নিয়ে ফিরে গেল সন্তুষ্ট চিত্তে।

মাইল দশেক থাকতে একটা পোস্ট অফিসের সামনে থামল রানা। যোরাকে নিয়ে নেমে গিয়ে ফোন করল ইস্তাম্বুল-হিল্টন হোটেলে। আগামী এক সপ্তাহের জন্যে বুক করল একতলার একটা কামরা। ম্যানেজার খানিকটা আপত্তি করেছিল, ঘরটা যদিও খালি আছে—অগোছাল হয়ে আছে খুব। রানা বলল বরাবর ও ওই রুমেই উঠেছে, ওটাই চাই ওর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল ম্যানেজার। ঘরটা যে রানাই অগোছাল করে রেখে এসেছে সে-কথা তার জানা নেই—সে ভাবল ওই ঘরের জানালা দিয়ে গোল্ডেন হর্ন আর বসফরাসের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় তারই জন্যে ওই ঘরটার প্রতি বিদেশীদের এত আকর্ষণ।

গাড়িতে ফিরে এসে যোরা জিজ্ঞেস করল, 'ইস্তাম্বুল-হিল্টন থেকেই তোমাকে বন্দী করা হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। ওই কামরা থেকেই।'

'সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছ?'

'এই একটিমাত্র জায়গা ছাড়া আর সব জায়গায় খুঁজবে আমাকে পুলিস আর ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা। এই ঝুঁকিটা না নিয়ে আর উপায় নেই।'

সী অভ মারমারা থেকে নিয়ে গোল্ডেন হর্ন পর্যন্ত মস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ইস্তাম্বুল শহর। অ্যাড্রিয়ানাপোল গেট দিয়ে ঢুকল ওরা শহরে। মিহ্রিমাহ্ মসজিদ ছাড়িয়ে সোজা এগিয়ে চলল ওরা দক্ষিণ-পুবে দ্বিতীয় মোহাম্মদের

মসজিদের দিকে। দেড় মাইল। ইস্তাম্বুল ইউনিভারসিটিকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেল ওরা আটময়দানের দিকে। সুলতান আহমেদের মসজিদ ছাড়িয়ে সেন্ট সোফিয়ার গির্জা। তারপরই প্রকাণ্ড লুনার পার্ক।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে একটা কুয়াশা কুয়াশা ভাব। ডিসেম্বরের বিকেল দ্রুত এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। সূর্যটা ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে পৌঁছল গিয়ে ওরা বসফরাসের ধারে। সী অভ মারমারাকে টুকটুকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য।

অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক ভিড় করেছে এই অপরূপ সূর্যাস্ত দেখতে। সবার মুখে, জামা-কাপড়ে লেগেছে এই রঙ। রঙীন মনে হচ্ছে পৃথিবীটা। সমুদ্রের ধারে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে তরুণ-তরুণী। অনেকে এসেছে বাচ্চা-কাচ্চা সমেত। নানান বয়সের সৌন্দর্য পিপাসু স্ত্রী-পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে চলে গেছে সাগরের ধার ঘেঁষে অনেক দূর। কেউ কেউ আবার গাড়িতেই বসে চেয়ে আছে সুদূরের পানে। লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে সিরকেসির বাজারের পরেই এই জায়গার স্থান। গাড়ি থামিয়ে বসে রইল রানা। সন্ধেটা পার করতে হবে।

ডুবে গেল সূর্য। কয়েক ফালি সাদা মেঘে ছোপ ছোপ আবীর লাগল। চারদিকে শান্ত সমাহিত একটা ভাব। এমনি সময়ে দুটো হারলি ডেভিডসনে চড়ে দু'জন সার্জেন্ট এসে উপস্থিত হলো। প্রমাদ গুণল রানা। গাড়িগুলোতে উঁকি দিয়ে খুঁজছে ওরা কি যেন।

'যোরা! সন্দেহ করল কি করে জানি না, কিন্তু ওরা যে আমাদের খুঁজছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। রিভলভারে গুলি আছে মাত্র একটা। এক গুলিতে দু'জনকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়, খানিকটা কৌশল করতে হবে। কাছে সরে এসো।'

রানার কণ্ঠে আদেশের সুর। কিন্তু যোরা বুঝে ফেলেছে রানার দুর্বলতা। মনে মনে হিসেব রেখেছিল সে-ও। আর মাত্র একটা গুলি আছে ওর কাছে। কাজেই হৃত সাহস ফিরে এল আবার ওর।

'তোমার আদেশ মানব না আমি, মাসুদ রানা।'

'না মানলে গুলি করব,' রিভলভার বের করল রানা।

'গুলি তুমি করবে না। কারণ তাহলে ধরা পড়ে যাবে সার্জেন্টদের কাছে। এইবার তোমাকে ফাঁদে ফেলেছি, মাসুদ রানা—এবার আর তোমার রক্ষা নেই। ধরা তোমাকে পড়তেই হবে। এখুনি ডাকব আমি সার্জেন্টকে।'

একজন সার্জেন্ট খুঁজছে ওপাশের গাড়িগুলো, আরেকজন এগিয়ে আসছে রানাদের দিকে। মরিয়া হয়ে উঠল রানা। বলল, 'আমার ধরা পড়া মানেই

মৃত্যুদণ্ড—কাজেই ধরা যদি পড়তেই হয়, তোমাকে মেরে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু হিসেবে তোমার ভুল আছে, সুন্দরী। আসলে তোমাকে আমি মারব না, আমার কথা না শুনলে দুইজন সার্জেন্টেরই মৃতদেহ দেখতে হবে তোমার এক মিনিটের মধ্যে।'

'কি করে?' বিস্মিত নীল চোখ মেলে চাইল যোরা রানার চোখে।

'পাঁচফুট দূরে থাকতেই খুন করব আমি এই সার্জেন্টটাকে। তারপর এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বের করে আনব ওর রিভলভার। ওটার মধ্যে ছ'টা গুলি পোরা আছে। দ্বিতীয় সার্জেন্টকেও শেষ করে দেব চমকের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই।' সার্জেন্টটা তখন আট ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। 'কাজেই, যদি অকারণে দু'জনের মৃত্যু দেখতে না চাও, তাহলে কাছে সরে এসো। এক্ষুণি।'

রানার কথার যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো যোরা। বুঝল এই লোকটার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। ভয়ে ভয়ে কাছে সরে এল সে। রিভলভারটা ঠেসে ধরল রানা ওর পেটে। বাম হাতে জড়িয়ে ধরল যোরার কোমর। কাছে টেনে আনল আরও।

'দুই হাতে জড়িয়ে ধরো আমাকে। ভান করো যেন কত ভালবাস।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক হাতে রানার গলা, অন্যহাতে পিঠ জড়িয়ে ধরল যোরা। এক মিনিট পার হয়ে গেল। করছে কি সার্জেন্টটা? এখনও আসছে না কেন?

ঝাড়া দুই মিনিট পর এল সার্জেন্ট। গাড়িতে একবার উঁকি দিয়েই চমকে সরে গেল সে। অপর সার্জেন্টও কাছাকাছি এসে পড়েছিল, কি যেন বলল ওকে নিচু গলায়। দুইজন হেসে উঠল। লাল হয়ে গেল যোরার কান, গাল। সার্জেন্ট দু'জন চলে গেল নিজের কাজে।

বাম হাতটা সরিয়ে আনল রানা যোরার কটি থেকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ওর বাঁধন থেকে। চুপচাপ বসে থাকল দু'জন।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ হয়। মেঘের গায়ের রঙ দ্রুত মুছে যাচ্ছে। চারদিকে ডিসেম্বরের কুয়াশা। ঠাণ্ডা বাতাসে একবার কেঁপে উঠল যোরা। শীত করছে ওর। নিজের কোটটা খুলে পরিয়ে দিল ওকে রানা।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার, সামনে দাঁড়ানো একটা ফিয়াট ইলেভেন হানড্রেড থেকে একজন লোক লক্ষ করছে ওদের। ড্রাইভিং সীটে বসে রিয়ার ভিউ মিরারটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে ওদের ওপর। চোখজোড়া পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। প্রকাণ্ড একটা কাঁধ দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে। মাথায় ডেনহাম হ্যাট। বাম হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরা।

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল আবার রানা শহরের দিকে।

তিন

সামনের গাড়িটাও নড়ে উঠল।

সারা শহরময় নানান গলিঘুঁচি ঘুরে ফিয়াট গাড়িটাকে খসিয়ে দিল রানা। আরও দেড়টি ঘণ্টা শুধু শুধু ঘুরল রেলওয়ে স্টেশন হয়ে আতাতুর্ক ব্রিজ, তারপর ইয়ুপ— সেখান থেকে সাত বুরুজের দুর্গ। আবার ব্যাপটিস্ট চার্চ হয়ে হস্পিটাল, সেখান থেকে জেনারেল পোস্ট অফিস, স্পাইস বাজার, সুলেমান মসজিদ, সিরকেসি হয়ে গালাটা ব্রিজ। রাত্রির ইস্তাম্বুলকে পিকাডিলি, হেলসিন্কি, নিউ ইয়র্ক থেকে পৃথক মনে হয় না। রঙ-বেরঙের নিয়ন সাইন, অ্যাডভারটাইজমেন্টের দপ্ করে জ্বলেই নিভে যাওয়া— কসমোপলিটান শহর। ঠাসাঠাসি করে লোক ওঠা বাসের কন্ডাকটার হাঁক ছাড়ছে টাকসিম, কারাকয়, বায়েজিত, ইয়ুপ।

জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে এখন রাস্তার ট্রাফিক-লাইট, জেব্রা চিহ্ন মান্য করে চলছে রানা। বিকেলের মত তাড়া নেই। গালাটা ব্রিজ পেরিয়ে ইস্তিকলাল দিয়ে এগোল রানা টাকসিমের দিকে। জন বিরল টাকসিমের উত্তরে আছে সুন্দর কয়েকটা বাগান, টেনিস ক্লাব, মিউনিসিপ্যাল ক্যাসিনো আর ইস্তাম্বুল রেডিও স্টেশন। সোজা এসে ঢুকল রানা ইস্তাম্বুল হিল্টন হোটেলের প্রকাণ্ড গেট দিয়ে।

গেট দিয়ে ঢুকে সামনেই নানান ফুলগাছ লাগানো প্রশস্ত লন। বসন্তকালে চেয়ার টেবিল পেতে দেয়া হয় এখানে। বাঁয়ে গেলে গ্যারেজ। সোজা গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল রানা লাল ওপেল রেকর্ড নিয়ে। পোর্টার এগিয়ে এল। হেডলাইটের সুইচ অফ করে দিল রানা। অন্ধকারে রানার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। রানা বলল, 'যাও তো বাছা, এক দৌড়ে রিসিপশনিস্টের কাছ থেকে দশ নম্বরের চাবিটা নিয়ে এসো। আমরা সোজা ঘরে যেতে চাই, ঘরটা আমার চেনা আছে, আগেও বহুবার এসেছি। খাতাপত্রে পরে সই করব—আমার ওয়াইফ খুব অসুস্থ। আর আমাদের লাগেজ আসছে আরেকটা গাড়িতে, তখন তোমার দরকার হবে। যাও, কুইক।'

একটা নোট গুঁজে দিল সে পোর্টারের হাতে। আন্দাজের ওপরেই বুঝল

পোর্টার নোটখানার মূল্য। সবিস্ময়ে চাইল সে রানার দিকে, অন্ধকারেই একটা স্যালিউট লাগিয়ে দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল হোটেলের দিকে। মস্ত কোনও সাহেব এসেছে আজ হোটেলে। কেবল সাহেব হলেও আবার হয় না—দিল থাকতে হয়।

লনের ওপর দিয়ে হেঁটে এগোল ওরা। কোটটা যোরার গা থেকে খুলে ডান হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে রানা, তার নিচেই প্রস্তুত আছে রিভলভার। বারান্দায় উঠে ডান ধারের শেষ কামরার সামনে চলে এল ওরা যোরা হেলে আছে রানার গায়ে ভর দিয়ে। যেন অসুস্থ।

কৃতার্থ পোর্টারের হাত থেকে চাবি নিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা দশ নম্বর কামরায়। যেমন রেখে গিয়েছিল রানা প্রায় তেমনি আছে ঘরটা। শুধু ওর জিনিসপত্রগুলো আর নেই—নিয়ে গেছে পুলিস। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা যোরার দিকে। বিছানার ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে সে। চেহারাটা একটু বিবর্ণ।

'এই ঘরেই আজ রাত কাটাচ্ছি আমরা। কাল ট্রেনে চলে যাব আঙ্কারা।'

টেলিফোনে খাবারের আদেশ দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে যোরার সামনে বসল রানা। ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে খুলে ফেলল। ব্যাগ থেকে আই-ব্রাউ পেন্সিল, লিপস্টিক, রুজ আর পাউডার বের করে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিপুণ হাতে যোরার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিল সে। চিনবার উপায় রইল না যোরা বলে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে একটা বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল যোরার মুখ থেকে। সম্পূর্ণ অন্য এক রমণী।

'বেয়ারা খাবার নিয়ে এলে তুমি নেবে ট্রে-টা ওর হাত থেকে। আমি কাগজ পড়বার ভান করে চেহারা আড়াল করব। কিন্তু মনে রেখো, কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করলে এক মুহূর্ত দ্বিধা করব না। বেপরোয়া লোক আমি!'

চমৎকার ডিনার এবং এক বোতল 'রাকি' রেখে গেল বেয়ারা। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল ওরা দু'জন। মোটা বকশিশ পেল বেয়ারা যোরার মারফত। খুশি মনে টেবিলের ওপর আরেক বোতল রাকি সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল সে এঁটো থালা বাসন নিয়ে শিস দিতে দিতে। বল্টু লাগিয়ে দিল যোরা দরজার।

'এইবার?' রানার গ্লাসটা পূর্ণ করে দিয়ে নিজেও এক গ্লাস রাকি ঢেলে নিল যোরা।

'বিছানায় যেতে হবে। আমি এই ইজি-চেয়ারে বসে পাহারা দেব।'

'যাতে পালিয়ে না যাই সেজন্যে?'

'হ্যাঁ। তাহলে আমারও পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমাকে নিয়ে কি করবে শেষ পর্যন্ত?'

'তা আমিও জানি না।'

'নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব?'

'পারবে। কেউ জ্বালাতন করলে খুন করে ফেলব।'

রানার কথাটা বিশ্বাস করল কি না বোঝা গেল না, ভয়ে ভয়ে বিছানায় উঠে পড়ল যোরা। আধঘণ্টা এপাশ-ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রানাও পা দুটো লম্বা করে দিয়ে আরাম করে হেলান দিল ইজি চেয়ারে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল রানা। সামান্য খুট শব্দ হতেই একটা চোখের পাতা খুলল সামান্য। অতি সাবধানে নামছে যোরা। একবিন্দু কাঁপল না রানার চোখের পাতা। শ্বাস-প্রশ্বাসও চলতে থাকল সমান তালে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল যোরা। যখন বুঝল ঘুম ভাঙেনি রানার, তখন মৃদু হেসে নেমে পড়ল মেঝেতে। বিছানার ধার থেকে জুতো জোড়া আর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে পা টিপে চলে গেল বাথরুমের দিকে।

বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা। এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। বাথরুমের ভেতর খুট করে একটা শব্দ হলো। মুচকে হাসল সে। তাহলে এই মতলবই ছিল যোরার!

নিঃশব্দে বল্টু খুলে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে। দীর্ঘ পদক্ষেপে বারান্দা পেরিয়ে বাথরুমের পেছনে চলে এল সে অন্ধকার শিশির ভেজা লনের ওপর দিয়ে। অসংখ্য তারায় ছেয়ে আছে ইস্তাম্বুলের আকাশ। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া আসছে কৃষ্ণসাগর থেকে।

ঠিকই বুঝেছে রানা। বাথরুমের জানালাটা খোলা। অর্ধেকটা দেহ বেরিয়ে এসেছে যোরার সিকবিহীন জানালা গলে। পালাচ্ছে সে।

'আহা-হা! পড়ে যাবে। এসো আমি কোলে করে নামিয়ে দিচ্ছি।' আলগোছে নামিয়ে আনল রানা যোরাকে।

ধরা পড়ে গিয়ে কান পর্যন্ত লাল হয়ে গেল যোরার। মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে নিল সে। তারপর মাথা তুলে চাইল রানার দিকে। দৃষ্টিটা সরে গেল ওর রানার মুখের ওপর থেকে। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে কি যেন দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ।

রানা বুঝল হার হয়ে গেছে। তবুও দ্রুত রিভলভারের বাঁটের কাছে চলে গেল ওর ডান হাত। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল ওর। এক সেকেন্ডের এদিক ওদিকেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে

গেল। পিঠের ওপর অনুভব করল সে একটা পিস্তলের নল। মোলায়েম কণ্ঠে কানের পাশ থেকে কেউ বলল, 'দয়া করে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে ধরুন, মি. মাসুদ রানা।'

চার

ধীরে ধীরে আদেশ পালন করল রানা। যোরার নীল দুই চোখে জ্বলজ্বল করছে মুক্তির আনন্দ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে দেখল রানা একবার। সেই লোকটাই, ভুল নেই তাতে। কোটের পকেট থেকে রানার রিভলভারটা আলগোছে তুলে নিল যমদূতের মত লোকটা।

'এখানে হৈ-চৈ না করে আসুন আপনাদের ঘরে গিয়ে দু'একটা খোশগল্প করা যাক। আপনিই পথ দেখান, মিস যোহ্‌রা।'

নিঃশব্দে এসে ঢুকল ওরা আবার দশ নম্বর কামরায়। ছিটকিনি তুলে দিল পেছনের লোকটা। এই এক সেকেন্ডের অসতর্কতার সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা লোকটার ওপর প্যান্থারের মত। কিন্তু আশ্চর্য, পেছনেও চোখ আছে নাকি লোকটার? সাঁ করে সরে গেল সে এক পাশে। দড়াম করে দরজায় ঠুকে গেল রানার মাথা। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল লোকটা রানার দুই বাইসেপ, অক্লেশে শূন্যে তুলে নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে। কার্পেটের ওপর নামিয়ে দিয়ে কয়েক পা সরে গেল।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা লোকটাকে। লম্বায় রানার চাইতে আধ হাত উঁচু হবে, আর চওড়ায় রানার তিনটের সমান। অদ্ভুত ধূর্ত দুই চোখ থেকে উজ্জ্বল বুদ্ধির দ্যুতি বেরোচ্ছে। ডেনহাম হ্যাটটা তেমনি পরা আছে মাথায়। যোরা, রানা দু'জনেই বুঝল এ-লোক সহজ লোক নয়। প্রতিটা মুহূর্তে সে তৈরি আছে রানার জন্যে, যে-কোনও কিছু করে বসতে পারে লোকটা বিদ্যুৎগতিতে, শরীরটা যেন ওর স্প্রিং দিয়ে তৈরি।

'তাহলে তুমিই ফিয়াট ইলেভেন হানড্রেডে করে পিছু নিয়েছিলে আমাদের লুপার পার্ক থেকে? তা এই জায়গা চিনলে কি করে?'

'অতি সহজে। যখন বুলগেরিয়ার দিকে না গিয়ে ফিরে এসেছ আবার ইস্তাম্বুলে তখন তোমাকে দুঃসাহসী আখ্যা দেয়া যায়। আর তাই যদি হয়, তোমার পক্ষে হোটেলের যে কামরা থেকে ধরা পড়েছ সেই কামরাটাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করাই স্বাভাবিক। নয় কি? কিন্তু ওসব বাজে কথা, আমি

পরিষ্কার দেখেছি তোমাদের এখানে ঢুকতে। একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফিয়াটটা রেখে ট্যাক্সিতে করে ঘুরছিলাম তোমাদের পেছন পেছন। খসিয়ে দিতে পারোনি আমাকে তুমি।'

'বুঝলাম খুব বুদ্ধিমান লোক তুমি। কিন্তু তোমার সঙ্গে পুলিস কোথায়?'

'পুলিস?' একটু যেন অবাক হলো লোকটা। 'পুলিস দিয়ে কি হবে? তোমাকে বন্দী করবার জন্যে আমিই যথেষ্ট। একগাদা পুলিস এলে কি লাভ হত? তাছাড়া আমি অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক, সব সময় পুলিসের সহযোগিতা লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' জিজ্ঞেস করল যোহ্‌রা।

'প্রাইভেট তো বটেই, কিন্তু ঠিক ডিটেকটিভ নই। যদিও বুদ্ধিমত্তা নিয়েই আমার কারবার। যাক আপাতত আমার নাম জানলেই চলবে, কি করি সেটা যথাসময়ে জানতে পারবেন। গরীবের নাম আবু তাহের। আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে আর কোনও প্রশ্ন করবেন, না আমার কাজ আরম্ভ করব?'

'চিনলে কি করে আমাদের?' প্রশ্ন করল রানা।

'তুরস্কের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি হাসান খলীলের মেয়েকে চিনব না? আরসিডি শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসান খলীল। বলো কি হে? তার ওপর সেই মেয়ে যদি টার্কীর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়, কাগজে ফটো বেরোয়, তবে তাকে কে না চিনবে? ওইখানেই তোমার বোকামি হয়ে গেছে, মাসুদ রানা। কোর্টরুম থেকে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে বেছে নিয়ে ভেবেছ চমৎকার কাটবে সময়টুকু, আসলে সেই মুহূর্তে ভাগ্যদেবী ঈর্ষান্বিত বোধ করে রুষ্ট হয়েছেন তোমার ওপর। সরকার তোমার মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করেছেন দশ হাজার পাউন্ড, তার বিশ মিনিটের মধ্যে হাসান খলীল সাহেব ঘোষণা করলেন: তাঁর মেয়েকে যে উদ্ধার করে দিতে পারবে তাকে দেবেন দশ হাজার পাউন্ড এবং মাসুদ রানাকে যে ধরতে পারবে তাকে আলাদা ভাবে পুরস্কার দেবেন পাঁচ হাজার পাউন্ড। এইসব খবর যদি রাখতে তাহলে আর যোহ্‌রা হাসানকে নিয়ে খোলামেলা জায়গায় বেড়াবার সাহস হত না। হাজার হাজার লোক লেগে গেছে তোমাদের পেছনে পুরস্কারের কথা শুনে। আমার কপাল ভাল—পেয়ে গেলাম আমিই।'

পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল আবু তাহেরের মুখে। পকেট থেকে একটা নাইলন কর্ড বের করল সে। বলল, 'ঘুরে দাঁড়াও, মাসুদ রানা। তুমি খুবই ভয়ঙ্কর লোক। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার মাথায় এখন কি চিন্তা

ঘুরছে। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে যদি তোমার কোনও রকম জ্ঞান থাকত তাহলে ওইসব ছেলেমানুষী চিন্তা তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে। কিন্তু তোমার এখন বেপরোয়া অবস্থা, স্থির মস্তিষ্কে কিছু চিন্তা ভাবনার উপায় নেই, তাই তোমাকে সাবধান করেও লাভ নেই—তবু বলছি, কোনও কিছু করে বসলে কিন্তু পরে অনুশোচনা হবে তোমার। চেষ্টা করে দেখতে পার।'

হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, হালকা পায়ে পেছনে এসে দাঁড়াল আবু তাহের, পরমুহূর্তে 'কোঁক' করে একটা শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে। রানার কনুইটা রেস এঞ্জিনের পিস্টনের মত গিয়ে পড়েছে ওর পাঁজরের ওপর। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুলগুলো সোজা রেখে প্রাণপণ শক্তিতে কারাতের কোপ মারল রানা আবু তাহেরের গলা লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎগতিতে বাঁ হাত তুলে আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল আবু তাহের মাঝ রাস্তায়। দড়াম করে নাকের ওপর তিন মণ ওজনের এক ঘুসি খেয়ে চোখে অজস্র সর্ষেফুল দেখতে পেল রানা। পড়ে যাচ্ছিল, হাতটা বেকায়দা মত ধরে মোচড় দিতেই কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল মাটিতে। জোরে ঠুকে গেল মাথা। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে পাঁজরের ওপর সজোরে একটা লাথি এসে পড়ল। আঁধার হয়ে গেল সবকিছু।

মিনিট দুয়েক পরেই জ্ঞান ফিরে পেল মাসুদ রানা। ততক্ষণে শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেছে ওর হাত-পা। বাথরুমের দরজা পর্যন্ত ছেঁচড়ে টেনে নিয়েছে আবু তাহের ওর দেহটা, কল থেকে পানি এনে ওর চোখেমুখে ছিটাচ্ছে যোরা।

ককিয়ে উঠল রানা তীব্র ব্যথায়। তারপর কোনও মতে উঠে দরজায় হেলান দিয়ে বসল। ওপরের ঠোঁটটা ফুলে গেছে, খুব সম্ভব কেটেছেও খানিকটা—নোনতা স্বাদ অনুভব করল ও মুখের ভেতর।

'পানি,' দুর্বল কণ্ঠে বলল রানা।

একটা গ্লাসে রাকি ঢেলে এগিয়ে এল আবু তাহের।

'তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, বন্ধু। কথা শুনলে আর এই অবস্থা হত না। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত...' কথা শেষ না করেই লাফিয়ে সরে গেল আবু তাহের ডান ধারে। ছল্‌কে খানিকটা রাকি পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

দেহের সর্বশক্তি দিয়ে জোড়া পায়ের লাথি চালিয়েছিল রানা। আবু তাহের সময় মত সরে যাওয়ায় ধড়াশ করে পা দুটো পড়ল মাটিতে।

'তুমি ভয়ঙ্কর লোক মাসুদ রানা। কিন্তু তোমার এইসব কৌশল বড় অপাত্রে প্রয়োগ করছ। শাস্তি তো দিই-ই নি। এ পর্যন্ত শুধু ঠেকিয়েছি। আর একবার এই ধরনের অভদ্রতা করলে সমুচিত শাস্তি পাবে।' টেবিলের ওপর

ঠক্ করে গ্লাসটা রেখে দিল আবু তাহের। তারপর ফিরল যোরার দিকে। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। মিস্ যোহরা, আপনার বাবাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? বাড়িতে, না ডক ইয়ার্ডে?'

'বাড়িতেই থাকবেন এখন উনি।' ভক্তিতে গদ গদ যোরার কণ্ঠস্বর। রানাকে এভাবে না মারলেই অবশ্য ভাল হত, বিচারে মৃত্যু তো হবেই ওর; কিন্তু এই লোকটাকেও দোষ দেয়া যায় না, রানাই তো আগে মেরেছে।

'নম্বর কত, টেলিফোন নম্বর?'

'সিক্স টু ডাবল্ টু ওয়ান।'

টেলিফোন রিসিভার কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করল আবু তাহের। গুণে গুণে তিনটে রিং-এর পরই খটাং করে টেলিফোন তুলল ওপাশে কেউ।

'হ্যালো!' কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে বলল কেউ।

'মিস্টার হাসান খলীল বলছেন?'

'না, আমি তাঁর পি. এ. বলছি। আপনি কে বলছেন? কি দরকার?'

'আমার নাম বললে চিনবেন না। তবু বলছি, আবু তাহের। হাসান খলীল সাহেবের মেয়ের ব্যাপারে কিছু কথা আছে তাঁর সঙ্গে। ওঁকে ফোনটা দিন।'

'আমাকে বললেই আমি খবরটা তাঁকে পৌঁছে দেব। উনি আসলে এখন খেতে বসেছেন। খোঁজ পেয়েছেন যোহরা হাসানের?'

'আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি কোনও আলাপ করতে চাই না। কিছু মনে করবেন না। ওঁর খাওয়া হয়ে গেলে আমি আবার রিং করব

'বেশ। আপনার ফোন নাম্বারটা দিন।'

'দুঃখিত। সেটাও দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমি নিজেই আবার রিং করব। আচ্ছা, রাখি তাহলে...'

'দাঁড়ান!' চট করে বলল পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'আপনি এক মিনিট ধরুন, আমি বলছি ওঁকে। উনি হয়তো খাওয়া ছেড়েই আপনার কথা শুনতে চাইবেন।'

'বেশ, আমি ধরছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোরাকে জিজ্ঞেস করল আবু তাহের, 'আপনার আব্বা এত রাতে খাওয়া-দাওয়া করেন?'

'রাতে আব্বা খানই না। আসলে ওরা আব্বাকে...' কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেল যোরা। ঢোক গিলে নিয়ে বলল, 'এক্ষুণি আব্বা ছুটে আসবেন যে-কোনও কাজ ফেলে।'

'হ্যালো!' আবার রিসিভারের দিকে মনোযোগ দিল আবু তাহের।

'নিন, কথা বলুন মিস্টার হাসান খলীলের সঙ্গে,' বলল পার্সোনাল

অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপরই শোনা গেল একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। 'কে বলছেন আপনি? যোরার কোনও খবর আছে?'

'আমার নাম আবু তাহের। খবর আছে মানে? আপনার কন্যা এই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে!' যোরার দিকে ফিরে বলল, 'নিন, কথা বলুন।'

এক মিনিটের মধ্যে বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে সব জানাল যোরা ওর আব্বাকে। আবু তাহেরের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা আর শক্তি সাহস সম্পর্কেও বলল এক প্যারাগ্রাফ। এমনি সময় ছিনিয়ে নিল রিসিভারটা আবু তাহের যোরার হাত থেকে। অবাক হয়ে চাইল যোরা ওর দিকে। বাম হাতের ধাক্কায় যোরাকে ঠেলে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে কানে লাগাল সে রিসিভার।

'এখন বলুন দেখি আপনার কন্যাকে কি ভাবে আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া যায়?'

আবু তাহেরের কর্কশ ব্যবহার হাসান খলীল দেখতে পাননি কিছুই, তিনি ওর কণ্ঠস্বর শুনেই অকুণ্ঠ তারিফ করতে আরম্ভ করলেন। শেষে বললেন, 'আমি এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দেব, সঙ্গে লোকজন যাবে। ততক্ষণ আটকে রাখতে পারবেন তো ওই খুনীটাকে? আমি অল্প কিছুক্ষণ আগে পুরস্কারের অংকটা বাড়িয়ে পনেরো হাজার পাউন্ড করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কথাটা অবশ্য জানানো হয়নি কাউকে—আপনাকে আমি পনেরো হাজারই দেব। আপনি আমার যে উপকার…'

'প্রথম কথা, গাড়ি পাঠাবেন না,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল আবু তাহের। 'আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি এই হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। গাড়ি এখানে পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই, কাউকে পাওয়া যাবে না এখানে। আব দ্বিতীয় কথা, পুরস্কারের ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সেটা হলো, আপনার কন্যাকে উদ্ধার করে দিলে পনেরো হাজার দেবেন বলে কথা দিয়েছেন, সেটাকে দ্বিগুণ করে দিতে হবে। আর সরকারের পক্ষ থেকে মাসুদ রানার ওপর যে দশ হাজার পাউন্ড ঘোষণা করা হয়েছে সেটাও দয়া করে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। মোট হলো চল্লিশ হাজার আর মাসুদ রানাকে ধরে দিতে পারলে আপনি যে পাঁচ হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, সেটাকে ডবল করে দিলেই হয়ে গেল পুরোপুরি পঞ্চাশ হাজার। ব্যস। পঞ্চাশ হাজারই যথেষ্ট। রাজি আছেন?'

পনেরো সেকেন্ড কথা বলতে পারলেন না হাসান খলীল। তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রিসিভার কানে ধরে। এদিকে যোরার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে—দুই চোখ বিস্ফারিত। বলে কি লোকটা!

'আপনি…আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছেন?'

'না তো! ব্ল্যাকমেইল করব কেন? আমার ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে চাচ্ছি। আমি একটা প্রস্তাব দিলাম, আপনার পছন্দ না হলে প্রত্যাখ্যান করুন; তাহলে মাসুদ রানার বাঁধন খুলে দিয়ে আমি চলে যাই আমার কাজে। তারপর আপনার মেয়ের কপালে যা-ই ঘটুক, আমার কি?'

'আপনাকে পুলিসে দেব আমি। এর জন্যে কত বড় শাস্তি ভোগ করতে হবে আপনাকে, তা জানেন?'

'জানি। কিন্তু পাচ্ছেন কোথায় আমাকে? তাছাড়া আমি কিছু অন্যায় তো করছি না, বরং আপনার কন্যাকে উদ্ধার করে দিয়ে মস্ত উপকার করছি। খুনী মাসুদ রানাকে ধরে দিয়ে দেশের উপকার করছি। আপনি যদি একে ব্ল্যাকমেইল বলেন তো আমার কিছু বলবার নেই। আসলে কি জানেন, আপনাকে ছাড়া টাকা আদায়ের অন্য কোনও পথ নেই আমার। পুলিসের হাতে ওকে সমর্পণ করতে গেলে আমাকে সুদ্ধ বাঁধবে ওরা। মাত্র সাত দিন হলো জেল ভেঙে বেরিয়েছি কিনা। বুঝতে পারছেন না আমার অবস্থাটা?'

চমকে উঠল যোরা। এ কী কথা শুনছে! খুনীর হাত থেকে ছুটে ডাকাতের হাতে পড়েছে সে! কার মুখ দেখে উঠেছিল আজ ঘুম থেকে? এ বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছে সে।

'এক মিনিট, ধরুন।' ওপাশ থেকে হাসান খলীলের গলা শোনা গেল। দ্রুত কি যেন আলাপ করছেন তিনি আরেকজনের সঙ্গে মাউথপিসটা হাতে চেপে ধরে। অনেক চেষ্টা করেও একটি বর্ণও বুঝতে পারল না আবু তাহের। এবার হাসান খলীলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল পরিষ্কার। অনেকটা সামলে নিয়েছেন তিনি। 'বেশ, আপনার প্রস্তাবে রাজি আছি আমরা। কিন্তু মাসুদ রানাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।'

'ওকে আবার নেওয়ার কি দরকার? পুলিসে ফোন করে দিলে ওরাই ধেয়ে আসবে নাচতে নাচতে।'

'ওকে আমি নিজ হাতে পুলিসের কাছে সোপর্দ করতে চাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আমার। আপনি একা পারবেন তো ওকে সামলাতে, না লোক পাঠাব?'

'আমি একাই একশো। কিন্তু পেমেন্টের ব্যাপারে আবার গোলমাল করবেন না তো?'

'এ ব্যাপারে আমার মুখের কথাই যথেষ্ট নয় কি? রাজি যখন হয়েছি, তখন পাবেন আপনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। কিন্তু ক্যাশ দিতে পারব না, চেক পাবেন এবং আগামীকাল নিশ্চিন্তে ভাঙিয়ে নিতে পারবেন চেকটা। কোনও লোক বা পুলিস পিছনে লাগবে না। কথা দিচ্ছি। এটা আমার ওয়ার্ড অভ

অনার।'

'বেশ। ধন্যবাদ। আসছি আমি ওদের নিয়ে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল আবু তাহের।

পাঁচ

'ড্রাইভিং সীটে ওঠো তুমি।' পিছন থেকে গুঁতো মারল আবু তাহের রানার পিঠে ফরটি ফাইভ ক্যালিবারের কোল্ট ডিটেকটিভ পিস্তল দিয়ে। নিঃশব্দে ফিয়াট ইলেভেন হানড্রেডের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা।

'আর আপনি বসুন ওর পাশের সীটে।'

নিঃশব্দে আদেশ পালন করল যোরাও। এবার পিছনের সীটে উঠে বসল আবু তাহের। যোরা হাতের বাঁধন খুলে দিল রানার। পকেট থেকে ইগনিশান কী-টা বের করে ধরিয়ে দিল আবু তাহের রানার হাতে। পিস্তলের মুখটা ঠেকাল রানার মাথায়।

'বিশ মাইল স্পীডে চালাবে গাড়ি। যেদিক বলব সেদিকে যাবে, নইলে বুঝতেই পারছ।' আস্তে দুটো টোকা দিল সে পিস্তলের নল দিয়ে রানার মাথায়।

স্থির নিষ্কম্প হাতে গাড়ি চালিয়ে কোটিপতি হাসান খলীলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল রানা। হর্ন দেবার আগেই দুপাট খুলে গেল লোহার গেট। রানা লক্ষ করল বাড়িটা একটা সুরক্ষিত দুর্গের মত। আগাগোড়া মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঢুকবার একমাত্র পথ এই লোহার গেট। গেটে সশস্ত্র প্রহরী। চারপাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ছেড়ে এরিয়ার ঠিক মাঝখানটায় হাল ফ্যাশানের চমৎকার একখানা দোতলা বাড়ি। ফাঁকা জায়গায় ফুলের বাগান টেনিস লন আর একটা ছোট্ট পুকুর ছাড়াও আছে সার্ভেন্টস্ ব্যারাক, মালির স্টোর ও কিচেন। খটাং করে লোহার গেটটা বন্ধ হয়ে গেল পিছনে।

গাড়ি বারান্দায় এসেই ব্রেক কষে গিয়ার নিউট্রাল করে হ্যান্ডব্রেক টেনে ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল রানা। একটু অবাক হয়ে যোরা ভাবল, এতখানি বাধ্যতা তো রানার চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না! কি প্ল্যান আঁটছে মনে মনে এই ভয়ঙ্কর লোকটা?

তরতর করে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধ। নাদুস-নুদুস আপনভোলা চেহারা। একমাথা এলোমেলো পাকা

চুল। ভ্রূ পর্যন্ত পাকা। পুরু লেন্সের চশমা চোখে। যোরাকে জ্যান্ত অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বুড়োর নিষ্প্রভ চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি। নেমে দাঁড়াতেই পরম স্নেহে হাত রাখল সে যোরার কাঁধে, অপর হাতে চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করছে সত্যিই ঠিক আছে কিনা যোরা।

'এখনও ঘুমাওনি তুমি, ডাকু চাচা? তোমার না নয়টার সময় ঘুমিয়ে পড়ার কথা?' যোরার কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তিরস্কার।

ধমক খেয়ে অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল বৃদ্ধ। ভয়ে ভয়ে বলল, 'তোকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেল, আমি ঘুমাই কি করে বল্?'

'তোমাকে আবার কে বলল? নিশ্চয়ই আব্বাজী?' সব রাগ গিয়ে পড়ল ওর আব্বার ওপর। নিশ্চয়ই ওর বিপদের কথা জানিয়েছে আব্বা এই আপনভোলা অসুস্থ বৃদ্ধকে। অস্থির পায়ে পায়চারি করে বেড়িয়েছে ডাকু চাচা এতক্ষণ, আর বকর বকর করেছে মুজাদ্দিদের সঙ্গে। কিছুতেই ঘুমাতে পারেনি। 'যাও, এখন তো পেয়ে গেলে আমাকে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো গিয়ে। আবার ব্লাড প্রেশারটা বাড়িয়ে তুললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি, ডাকু চাচা।'

'তুই চুপ কর তো!' এবার খেপে উঠল বৃদ্ধ। 'তোরা কি পেয়েছিস আমাকে? বাপ-বেটি মিলে সব সময় বক্‌বি? তোদের থোড়াই পরোয়া করি আমি, তা জানিস? ব্লাড-প্রেশার! ব্লাড-প্রেশার তো তোরাই বাড়িয়ে তুলছিস। মেয়েটাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেল, কেউ একটা খবর পর্যন্ত জানাল না। শেষ পর্যন্ত রেডিও থেকে জানতে হলো আমার সে খবর। কিন্তু কী সাঙ্ঘাতিক ডাকাতরে, বাবা!' কট্‌মট করে ভুরু কুঁচকে চাইল বৃদ্ধ আবু তাহেরের দিকে। তারপর যোরাকে ছেড়ে রানার একটা হাত চেপে ধরল। মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। 'তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব বুঝেই পাচ্ছি নে, বাবা। মস্ত উপকার করেছ তুমি আমাদের। তুমি রক্ষা না করলে খুনী ডাকাতটা যে মেয়েটার কি সর্বনাশ করত ভাবতেই আমার...' আবার কটমট করে চোখ পাকিয়ে তাকাল বৃদ্ধ আবু তাহেরের দিকে।

হেসে ফেলল যোরা। বলল, 'কি যা-তা বকছ, ডাকু চাচা...'

'তুই চুপ কর,' ধমকে উঠল বৃদ্ধ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। 'আমি কিন্তু আসলে ডাকাত নই। হাসান খলীলের বাল্যবন্ধু। "ডাক্তার চাচা"-কে ও বানিয়ে নিয়েছে 'ডাকু চাচা"। পাগলী! একেবারে পাগল। সেই ছোটকাল থেকেই।' যোরার দিকে ফিরে বলল, 'সত্যি বলছিস। কোনও জখম হোসনি তো, মা?'

'না না, জখম হইনি। তুমি যাবে এবার ঘুমাতে?'

'ডাক্তার!' হঠাৎ গম্ভীর একটা কণ্ঠ কানে এল। রানা চেয়ে দেখল একজন দীর্ঘকায় অভিজাত চেহারার লোক এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। অনুমানেই বুঝল, যোরার বাবা। কোটিপতি হাসান খলীল। সঙ্গে চার পাঁচজন লোক। একজন দাঁড়িয়ে রইল হাসান খলীলের সঙ্গে, বাকি চারজন চট্ করে এসে দাঁড়াল রানা এবং আবু তাহেরের চারপাশে। রানা স্পষ্ট বুঝতে পারল হাসান খলীল ছাড়া বাকি প্রত্যেকটি লোক সশস্ত্র। প্রত্যেকেরই শোলডার হোলস্টারে লুকানো আছে আগ্নেয়াস্ত্র। 'তোমার অস্থিরতার নিশ্চয়ই অবসান হয়েছে? এবার নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। রাত অনেক হয়েছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। যাচ্ছি। ইদানীং তুমি কেমন যেন হয়ে গেছ, খলীল। কোনও ব্যাপারের মধ্যেই আমাকে আর রাখতে চাও না। কিসের থেকে আমাকে এমন আড়াল করে রাখছ তা তুমিই জানো। তোমার চেহারাও দিন দিন মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মত হয়ে যাচ্ছে। কাল মনে করে একবার আমার চেম্বারে এসো। থরো চেক-আপ্ করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি বাবা, ভুরু কোঁচকাতে হবে না।'

আপনভোলা ডাক্তার অদৃশ্য হয়ে যেতেই যোরার দিকে ফিরে হাসান খলীল বললেন, 'তুমি বিশ্রাম করো গিয়ে, যোরা, আমি কয়েকটা কাজ সেরে শুতে যাব। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

প্রথম ঘরটায় ঢুকে বামে দোতলার সিঁড়ির ওপর একটা পা রেখেই থম্‌কে দাঁড়াল যোরা। চেয়ে দেখল মুজাদ্দিদের সুঠাম, সুন্দর, একহারা চেহারার দিকে। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে ওপাশের দরজার মাঝখানে। চৌকাঠ ছুঁই ছুঁই করছে ওর মাথা। ডাকু চাচার ভক্ত শিষ্য। এম. বি. বি. এস. পাস করে ডাকু চাচার গবেষণাগারে তালিম নিচ্ছে সে গত দু'বছর থেকে। গুরু-শিষ্যের এমন সুন্দর পবিত্র সম্পর্কের তুলনা কেবল সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টোটলেই পাওয়া যায়—আর পাওয়া যায় পৌরাণিক ভারতের মুণিঋষিদের আশ্রমে। কিন্তু হলে কি হবে, মুজাদ্দিদের প্রেমের প্রতিদান সে দিতে পারবে না কোনও দিনই। ওই খুনীটার সংস্পর্শে আসার পর তো নয়ই। অন্তত ওই রকম পৌরুষ আর ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে ওর স্বামীর। নিজের অজান্তেই রানার দিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর। আহা, নষ্ট যদি না হয়ে যেত লোকটা! জোর করে সরিয়ে নিল সে তার দৃষ্টি রানার ওপর থেকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরতর করে দোতলায় উঠে গেল।

রানাদের নিয়ে আসা হলো একটা সুসজ্জিত ড্রইংরুমে। পকেট থেকে একটা হ্যান্ডকাফ বের করে রানার হাতে পরাতে যাচ্ছিল একজন, ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে রানা।

'কি ব্যাপার? তোমরা আমাকে হ্যান্ডকাফ পরাবার কে? পুলিস এসে যা করবার...উহ্!'

একজন কনুই মারল রানার পাঁজরে। সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা রানার একটা লেফট্ হুক খেয়ে। দু'পাশ থেকে দু'জন ধরল রানার হাত, আরেকজন পিছন থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে শুইয়ে দিল রানাকে মাটিতে। সেই অবস্থাতেই একজনের হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর লাগিয়ে দিল রানা স্টীলের পাত বসানো বুটের এক লাথি। আর্তনাদ করে বসে পড়ল লোকটা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বরে চম্কে উঠল ঘরের সবাই।

'খবরদার! যথেষ্ট হয়েছে!' হাসান খলীলের পাশের সেই লোকটা কথা বলে উঠল। তার হাতে চকচকে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। সোজা রানার বুকের দিকে ধরা।

'পুলিসে ফোন করে দিই, নিয়ে যাক। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। কি বলেন, ইয়াকুব বে?' বললেন হাসান খলীল।

'না।' টেলিফোনের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে থেমে গেলেন হাসান খলীল। 'আপাতত ওকে পুলিসে দেবার ইচ্ছে নেই আমার। ওকে আমার প্রয়োজন আছে। হাতকড়া পরাও ওকে।'

একজন মাটি থেকে হ্যান্ডকাফটা তুলে পরিয়ে দিল রানার হাতে। চাবি লাগিয়ে দিল হাতকড়ায়। এবার আর বাধা দেবার সাহস হলো না রানার। ইয়াকুব বে-র হাতের পিস্তলটা স্থির লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। বুঝল, কোটিপতি হাসান খলীল এ বাড়ির মালিক হলেও কর্তা এখানে ইয়াকুব বে। হুকুম করবার ক্ষমতা এখানে ইয়াকুবের, হাসান খলীল ওর হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

স্থির দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল রানা ইয়াকুবের মুখটা। গোল্ড ফ্রেমের চশমা, জুলফির কাঁচাপাকা চুল, আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে অভিজাত ভদ্রলোকের মত লাগছে ওকে দেখতে। কিন্তু একটু ভালমত নজর করতেই খসে পড়ল ওর আভিজাত্যের মুখোশ। রানা বুঝল, লোকটা করতে পারে না এমন কাজ নেই—সাক্ষাৎ শয়তান বাস করে ওর দেহের ভিতর। মাঝে মাঝে দুই চোখের ভয়াবহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেরিয়ে আসতে চায় ভিতরের পশুটা। এই লোক এখানে কেন? এর সাঙ্গপাঙ্গরাও একেকটা মার্কা মারা বদমাশ—এরা কেন ভর করেছে আরসিডি শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসান খলীলের কাঁধে? চমৎকার দামী কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রবেশী পকেটমারের মত লাগল রানার ইয়াকুব বে-কে। ফিটফাট জামা-কাপড়-জুতো, সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা হালকা পাতলা গড়ন, কিন্তু অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। ওর

চোখের দিকে চাইলে মনে হয় সম্মোহন করছে। নিষ্পলক সাপের চোখের মত।

'কি নাম তোমার?' ইয়াকুব এবার ফিরল আবু তাহেরের দিকে।

'আবু তাহের। তোমার?'

তুমি সম্মোধন করায় ভ্রূ কুঁচকে গেল ইয়াকুবের। কিন্তু কিছুই বলল না। চোখে চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'পুরস্কার নিয়ে কেটে পড়তে চাইছো এখন, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ। তোমাদের অভ্যর্থনার রীতি আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাই মাসুদ রানার সঙ্গে এই ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু তোমার ভয় নেই…'

'ভয় আমি কাউকে করি না।'

আবার কুঁচকে গেল ইয়াকুবের ভুরু। সামলে নিয়ে একই সুরে বলল, 'হাসান খলীল সাহেব যখন কথা দিয়েছেন, তখন পাবে তুমি পঞ্চাশ হাজাব পাউন্ড। নিন, সই করুন।' পকেট থেকে চেক বই বের করে এগিয়ে দিল সে হাসান খলীলের দিকে। 'কিন্তু, মাসুদ রানা যে ধরা পড়েছে আর আমাদের কাছে আছে, এই কথাটা বেমালুম চেপে যেতে হবে। অন্তত আগামী দুই দিন। প্রকাশ পেলেও অবশ্য কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্যে চেকে দুই দিন পরের ডেট দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যদি কানাঘুষা আরম্ভ হয় তাহলে পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হবে। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'দুই দিন কেন, আগামী দুই বছরেও একথা কাউকে বলবার প্রয়োজন পড়বে না আমার। টাকা পেলেই বোবা বনে যাব। কিন্তু দুই দিন পর চেক ভাঙাতে গিয়ে হাতকড়া পড়বে না তো হাতে?'

'না। আমরা বেঈমান নই।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল ইয়াকুব বে।

'দুঃখ এই, সেটার প্রমাণ পেতে দুই দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে আমাকে। যাক্, এছাড়া কোনও উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না। দাও, চেকটা নিয়ে কেটে পড়ি।'

এমনি সময় কি যেন বিড় বিড় করতে করতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল একজন লোক—রানার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে কেটে গেছিল ওর গাল, একটা সার্জিক্যাল টেপ লাগিয়ে ফিরে এসেছে। সোজা এগিয়ে গেল লোকটা আবু তাহেরের দিকে। ভাল করে পরীক্ষা করছে সে আবু তাহেরের মুখটা।

'কি হে, চেনা চেনা মনে হচ্ছে? শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলে কখনও?

'আবু তাহের! টার্কিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের আবু তাহের! এইবার চিনেছি। তুমি টার্কিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে ছিলে। দুই মাস আগে তোমার সাথে দেখা হয়েছিল আমার সেন্ট্রাল জেলে। তুমি...'

'কি বললে?' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ইয়াকুব চেয়ার ছেড়ে। মন দিয়ে শুনছিল সে লোকটার কথা। 'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লোক?'

'ছিল। তারপর একটা ব্যাঙ্ক লুটের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে জেল হয়েছিল। ব্যাপার কি হে, এত তাড়াতাড়ি বেরোলে কি করে?'

মাথায় কয়েকটা টোকা দিয়ে মৃদু হাসল আবু তাহের। 'মাথায় করে খামোকা একগাদা মগজ বয়ে না বেড়িয়ে এটাকে একটু খেলাতে জানলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তোমার মত পুরো টার্ম খাটতে হয় না। দু'মাসের মধ্যেই বেরিয়ে এসেছি। তোমার নাম কোকো না?'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল কোকো।

'ওর সম্পর্কে কি জানো তুমি, কোকো?' জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব। বসে পড়ল সে আবার।

'সাঙ্ঘাতিক লোক, স্যার। ও যখন সার্ভিসে ছিল বাঘের মত ভয় পেতাম আমরা ওকে। তাজ্জব হয়ে গেলাম যখন দেখলাম একদিন হাতকড়া পরে ঢুকল জেলের গেট দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওস্তাদ মেনে নিল ওকে। আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিন্তু জেলের আর সবাই নাকি ওর খবর আগেই জানতে পেরেছিল খবরের কাগজে। মস্ত বড় ডাকাতি করেছিল বাঘের বাচ্চা, আঙ্কারার পিপলস্ ব্যাঙ্কে।'

'বেশ বেশ। রীতিমত হাফেজ লোক দেখছি তুমি, হে! আমাদের হয়ে কিছু কাজ করবার ইচ্ছে আছে?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব।

'আপাতত নেই। আমি কর্তৃত্ব আর প্রভুত্ব পছন্দ করি না। আমি নিজেই নিজের প্রভু। তাছাড়া লোকে কাজ নেয় কেন, টাকার জন্যে তো? বেশ কিছু টাকা এসে যাচ্ছে হাতে আগামী দুই দিনের মধ্যে। কাজেই কাজের আমার দরকার নেই।'

রানাকে মাটি থেকে টেনে তুলে একটা ছোট্ট কুঠুরির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোকো দরজা খুলে ধরে আছে, আর দু'জন ধাক্কা দিয়ে ঢোকাল রানাকে কুঠুরির মধ্যে। দরজাটা লাগাতে যাচ্ছিল কোকো এমনি সময় দড়াম করে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারল রানা দরজার ওপর। নাকের ওপর ভারি কপাট এসে পড়তেই দুই হাত শূন্যে তুলে পড়ল কোকো আরেকজনের ওপর। চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল রানা ওদের ওপর। কেড়ে নিল কোকোর রিভলভার। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আবু তাহের। এক

লাথিতে রানার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলভার। রানার একটা পা মুচড়ে ধরল আবু তাহের।

'বোকামি কোরো না, মাসুদ রানা। আজ পুলিসের হাতে দিলে কালই ফাঁসি হত তোমার, এখানে অন্তত দুই-তিন দিন নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে পারবে।' বেকায়দা মত পা-টা মুচড়ে ধরে মোলায়েম কণ্ঠে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বোঝাবার চেষ্টা করছে আবু তাহের রানাকে।

'ঠিক বলেছ,' বলল ইয়াকুব বে। 'এখান থেকে বেরোলে আজ রাতের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে ও পুলিসের হাতে। আর আমাদের সাথে আক্রমণাত্মক ব্যবহার করলে লাভ তো নেই-ই, বরং অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ওর। কোহেন, লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার। একটা যোগ্য লোকও জোগাড় করতে পারোনি এবার।'

হঠাৎ রানার চোখে পড়ল, এতক্ষণ ধরে ঘরের এককোণে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে একজন লোক। প্রচণ্ড শক্তিশালী চেহারা। একেই দেখেছিল রানা কোর্ট-রুমে যোরার কাছাকাছি বসে থাকতে। চেহারা দেখেই বুঝেছে রানা, লোকটা খুনী। মুখের কোনও ভাব পরিবর্তন নেই। ইয়াকুবের কথায় মাথা নাড়ল সে কেবল। ধীরে সুস্থে একখানা ল্যুগার পিস্তল বের করল শোল্ডার হোলস্টার থেকে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই গুলি করল সে। সাঁ করে আবু তাহেরের হ্যাটটা উড়ে গেল ওর মাথার ওপর থেকে। শূন্যে থাকতেই পর পর আরও তিনটে গুলি বেরিয়ে গেল কোহেনের পিস্তল থেকে। অব্যর্থভাবে লক্ষ্য ভেদ করেছে প্রত্যেকটা গুলি।

স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরের প্রতিটা লোক। আবু তাহেরই সামলে নিল সর্বপ্রথম। রানার পা-টা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বাহ্! চমৎকার হাতের টিপ তো তোমার! দুঃখের বিষয় তোমার মাথায় টুপী নেই—থাকলে এই একই কায়দা দেখিয়ে অবাক করে দিতাম তোমাকে। যাই হোক, ইয়াকুব, আমার চেক্টা দিয়ে দাও। সেই সাথে হ্যাটটার দাম বারো পাউন্ড। আমি কেটে পড়ি। তারপর তোমাদের ছাগল তোমরা লেজে ছুরি চালাও, কি গলায় ছুরি চালাও সে তোমাদের ইচ্ছে।' চারজন প্রহরী রানার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতেই এগিয়ে এল আবু তাহের। চেকটা ওর হাতে দিতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিল ইয়াকুব বে।

'এর দ্বিগুণ টাকা পেতে পারো তুমি আমাদের হয়ে ছোট্ট একটা কাজ করলে।'

'কি কাজ?'

'এই লোকটাকে পাহারা দিতে হবে। আগামী দুই রাত এক দিনের মধ্যে

লোকটা যেন পালাতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে। যদি রাজি থাকো তাহলে এক লক্ষ পাউন্ড পাবে।'

'এতই দরকার তোমাদের এই লোকটাকে? কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার তোমার না জানলেও চলবে। রাজি কিনা বলো।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল আবু তাহের। তারপর বলল, 'লোভনীয় প্রস্তাব। দুই দিন আমাকে এমনিতেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কি শর্ত?'

'আমার ওপর মাতব্বরি মারতে পারবে না কেউ। আমি পাহারা দিয়ে রাখব এই লোকটাকে, কিন্তু তুমি ওই ছাগলগুলোকে নির্দেশ দিয়ে রাখবে আমাকে পাহারা দেবার জন্যে, তা চলবে না। একজনকে বন্দী করে রাখলাম, ওদিকে আমারই বন্দীদশা, সেটা সহ্য করতে পারব না আমি। আমাকে ফ্রিডম অভ মুভমেন্ট দিতে হবে।'

'বেশ। এই শর্তে রাজি আছি আমি। দোতলার চার নম্বর ঘরটা চিনিয়ে দাও ওকে, কোকো।'

চুপচাপ এতক্ষণ বসে ছিলেন হাসান খলীল। এই সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে যেন তাঁর কোনও সম্পর্কই নেই। তাঁর বাড়িতে যেন ভূতের কারবার চলেছে, তিনি আছেন স্বপ্নের ঘোরে। ক্লান্ত, অবসন্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাঁর মুখের চেহারা। চোখ দুটো বসে গেছে। কপালে-গালে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে বয়সের। মুকুটহীন রাজার মত লাগল তাঁকে রানার।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল আবু তাহের। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠাস করে এক চড় কষাল সে রানার গালে। অশ্লীল কয়েকটা গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে।

'শাট আপ্!' ধমকে উঠল আবু তাহের। তারপর কোকোকে বলল, 'পথ দেখাও, স্যাঙাৎ।'

'কিন্তু সাবধান, আবু তাহের।' সতর্ক করল ইয়াকুব বে। 'এই লোকটা ভয়ঙ্কর। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তোমার পতনের কারণ হতে পারে।'

মৃদুহেসে এগিয়ে গেল আবু তাহের কোকোর পিছন পিছন রানাকে সামনে নিয়ে। সিঁড়ি পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল ইয়াকুব বে। এক পা সিঁড়ির ওপর রেখেই হাত বাড়াল আবু তাহের। 'হ্যান্ডকাফের চাবিটা।'

হ্যান্ডকাফের চাবি নিয়ে উঠে এল সে রানার পিছন পিছন। ঘর খুলে দিল কোকো। প্রশস্ত একটা ঘরে চমৎকার চওড়া খাট পাতা। এই কামরা সংলগ্ন একটা ছোট্ট কুঠুরিতে চৌকি আছে একটা। ওই কুঠুরিটাই রানার বন্দীশালা।

ঘুরে ফিরে দেখে নিয়ে কোকোকে বিদায় করে দিল আবু তাহের।

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েই ফিরল সে রানার দিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কাছে। মুখে উদ্ভাসিত নিঃশব্দ হাসি। প্রথমেই রানার হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলল সে চাবি দিয়ে। তারপর নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল দু'জন।

ছয়

মোড় ঘুরেই চোখে পড়ল রানার, কথামত ঠিক ওষুধের দোকানটার সামনেই পার্ক করা আছে লাল ওপেল রেকর্ড। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে জন-বিরল রাস্তা দিয়ে গাড়িটার দিকে। ওর 'ফিলিপ পাটেক' রিস্ট ওয়াচে বাজে রাত সাড়ে এগারোটা।

গাড়ির পাশে এসেই অবাক হয়ে গেল রানা। গাড়িতে তো লোক থাকবার কথা ছিল না! অথচ ড্রাইভিং সীটে বসে আছে একজন মোটাসোটা ফরসা অপরিচিত লোক।

মিষ্টি করে হাসল লোকটা রানার দিকে চেয়ে, ইঙ্গিতে পাশের সীটে উঠে বসতে বলল। রানা উঠে বসতেই রওনা হলো গাড়ি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল দু'জনই। প্রথম কথা বলল লোকটাই।

'আমাকে গাড়ির মধ্যে দেখে অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' ভাঙাভাঙা ইংরেজি শুনে অবাক হয়ে গেল রানা আরও। সাদা চামড়া বটে, কিন্তু ইংরেজ নয় তাহলে!

'সেটাই স্বাভাবিক,' উত্তর দিল রানা। 'কিন্তু বেশিক্ষণ অবাক করে না রেখে পরিচয়টা দিয়ে ফেলুন। আমার পরিচয় বোধহয় দেবার প্রয়োজন হবে না?'

'না। আপনার পরিচয় ভাল করেই জানা আছে আমাদের। কিন্তু আমার পরিচয়টা দেবার আগে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। আমরা আসলে একটু অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি—সবটা শুনলে অবশ্য আপনি বুঝতে পারবেন এছাড়া আমাদের আর উপায় ছিল না।'

'অত ভণিতা করছেন কেন, আসল কথায় আসুন,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা।

'কেজিবি-র নাম শুনেছেন?'

'নিশ্চয়ই। রাশান সিক্রেট সার্ভিস।'

'আমার নাম কর্নেল নিকিতা ম্যাখারভ। কেজিবি-র এগজিকিউটিভ।'

রীতিমত চমকে উঠল রানা এবার। ব্যাপার কি! এর মধ্যে কেজিবি কেন? কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে কেজিবি-র এগজিকিউটিভ? তার পরিচয়ই বা জানল কি করে এরা?

'আমরা একটা মস্ত বড় বিপদে পড়েছি। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনার কাছে সাহায্যের আবেদন জানানোর জন্যে। নিরিবিলিতে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই, আপনার কি খুব অসুবিধা হবে?'

'আমার সঙ্গে কথা না বলে আমার হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই কি ভাল হত না? তাছাড়া আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। আপনারা বরং প্রপার চ্যানেলে আসুন।'

'আমাদের ব্যাপারটাও আপনার কাজের সঙ্গে জড়িত। এবং অত্যন্ত জরুরী। আপনার হেড অফিস থেকে অনুমতি আনতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আপনি যদি দয়া করে দশটা মিনিট সময় ব্যয় করেন তাহলে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি—সব শুনলেই আপনি এর গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারবেন। এর সঙ্গে আপনাদের স্বার্থও কিছুটা জড়িত আছে। এই আপনার গন্তব্যস্থলে এসে গেছি। ওই ছাপড়ার মধ্যেই কথা বলতে পারি আমরা। আসব আমি আপনার সঙ্গে?'

রানা বুঝল, হাল ছাড়বার জন্যে এই লোক পিছনে লাগেনি—শুনিয়েই ছাড়বে ওর কথা। তাছাড়া অজানা অনেক তথ্যও হয়তো জানা যাবে। রাজি হয়ে গেল সে। দু'জনে গিয়ে ঢুকল সী অভ মারমারার তীরে একটা মাছ ধরার সরকারী ছাপড়ার মধ্যে। রানার জন্যে একুয়া লাং (ডুবুরীর পোশাক) রাখা আছে ছাপড়ার এক কোণে। সেদিকে চেয়ে মৃদু হাসল নিকিতা ম্যাখারভ। রাশান সোভরেনির প্যাকেট থেকে নিয়ে একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগাল। আগুন ধরিয়ে নিয়ে বক্তব্য শুরু করে দিল ম্যাখারভ।

'বুলগেরিয়ার ভার্নাতে অ্যাটমিক গবেষণাগার তৈরি করেছিলাম আমরা বছর তিনেক আগে। অত্যন্ত গোপনে সেখানে কয়েকটা আধুনিক অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে লেনিন M-315, জিনিসটা হচ্ছে অ্যাটম বোমার ক্ষুদ্র একটা সংস্করণ। ফাইটার প্লেন অথবা মোবাইল রকেট লঞ্চার থেকে ছাড়বার উপযোগী করে তৈরি হয়েছে সেটা। ছোট্ট জিনিস। খুব বেশি হলে এক বর্গ মাইল এলাকা ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু তবু খেলনা নয়—পাঁচ হাজার টন টি.এন্ড.টি.-র সমান ক্ষমতা রাখে সেটা। লম্বায় ছয় ফুট, পলিশড্

অ্যানোডাইজড্ অ্যালুমিনিয়ামের কাভার, সিলিন্ডার শেপ, বারো ইঞ্চি ডায়ামিটার, মাথাটায় পাইরোসেরাম নোজ ক্যাপ লাগানো, ওজন আড়াইশো পাউন্ড। মাত্র দিন তিনেক হলো প্রথম বোমাটা তৈরি হয়েছিল। খোয়া গেছে সেটা।'

'খোয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। সেই সাথে বৈজ্ঞানিক ডক্টর নিকোলাই সেরভও গায়েব। তিনিই ছিলেন এই রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর। সবাই ওঁকে লালচুলো সেরভ বলেই জানে। গত পরশু অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন তিনি। প্রায়ই এমন হয়, কারও চোখেই সেটা অস্বাভাবিক ঠেকেনি। কাজ শেষ করে অনেক রাতে তাঁর মস্কোভিচ্ স্টেশন ওয়াগনে করে বেরিয়ে যান কমরেড সেরভ রিসার্চ সেন্টার থেকে। গেটের প্রহরীরা ওঁর গাড়ি চেনে, ড্রাইভিং সীটে লালচুলো সেরভকে দেখে কিছুই সন্দেহ করেনি ওরা, স্যালিউট করে পথ ছেড়ে দিয়েছে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টেনে আবার আরম্ভ করল ম্যাখারভ। 'ভার্নার সোয়া দুশো মাইল পশ্চিমে সোফিয়ার উপকণ্ঠে পাওয়া গেছে স্টেশন ওয়াগনটা। ডক্টর নিকোলাই সেরভ অথবা লেনিন M-315 কারও চিহ্নও আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। প্রায় দশ ঘণ্টা পর ল্যাবরেটরিতে পাওয়া গেছে দু'জন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের লাশ—দু'জনকেই গুলি করা হয়েছে হৃৎপিণ্ড বরাবর সাইলেন্সার-যুক্ত কোনও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে।

'আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম এটা সিআইএ-র কাজ। পুরো একটা দিন এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের সর্বশক্তি আমরা নিয়োগ করেছিলাম ভুল পথে। সিআইএ-এ ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না—কিন্তু এখন টের পেয়ে গিয়ে ওরাও হন্যে হয়ে খুঁজতে লেগেছে, কোনও ভাবে বোমাটা হস্তগত করতে পারলে মস্ত উপকার হবে ওদের। যাক, সারাদিন খোঁজার পর আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে জরুরী তার এসেছে, আসলে সোফিয়ার দিকে যায়নি সেরভ, আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে গাড়িটা পাঠানো হয়েছিল সেখানে। কৃষ্ণসাগর উপকূলে ভার্না শহর। বোমাসহ কমরেড সেরভকে পাচার করা হয়েছে মোটর বোটে করে। বসফরাস দিয়ে সোজা চলে এসেছে ওরা ইস্তাম্বুল।'

'কারা কি উদ্দেশ্যে করল কাজটা?' জিজ্ঞেস করল রানা এতক্ষণ পর।

'মাফিয়া। উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি।'

'মাফিয়া!' চমকে উঠল রানা। 'ওরা কি করবে অ্যাটম বোমা দিয়ে?'

'সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ইস্তাম্বুলে এদের বিশেষ তৎপরতা বিশ্লেষণ করে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি খবরটা ভিত্তিহীন নয়। এবং আপনারা যাদের পিছনে লেগেছেন, কাজটা তাদেরই।'

'আচ্ছা : এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছেন?'

'না। আপনাদের মত আমরাও এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছি—কিন্তু কূল-কিনারা পাইনি কোনও। গত তিনমাস থেকেই আমরা আপনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে। শিকারী এবং শিকার দুই দলের ওপরই রেখেছি আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ শত্রু ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর কোনও ব্যাপার ঘটতে চলেছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না মাফিয়ার টার্কিশ চীফ এতদিন হীরা-মুক্তার চোরাচালানেই সন্তুষ্ট ছিল, হঠাৎ আরসিডি শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের পিছনে লাগল কেন? ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসান খলীলের ওপরই বা ওরা এভাবে প্রভাব বিস্তার করল কেন? মাফিয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই নতুন করে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না আপনাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠান হঠাৎ এই অদ্ভুত কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করল কেন।'

'যাক, যেটা আমিও জানি না আপনিও জানেন না সেটা নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান বলে ফেলুন। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। ফিরতে হবে আমাকে।'

'আমরা জানি, আজ রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ডক ইয়ার্ড চষে ফেলেও আপনি কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারেননি। এখন এই অ্যাকুয়া লাং পরে যাচ্ছেন ওদের ওই ইয়টে, যদি কিছু সূত্র পাওয়া যায় সেই চেষ্টায়। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি মনে করেছিলাম ডক ইয়ার্ডে রাখা ওই প্রকাণ্ড চারটে বাক্সের মধ্যে কোনও সূত্র পাওয়া যাবে—কিন্তু অবাক কাণ্ড, বাক্সগুলো একেবারে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই ওর ভেতর।'

'কিচ্ছু নেই? আশ্চর্য তো! অথচ বাক্সগুলো যাচ্ছে এথেন্সে ডেলিভারির জন্যে।'

'সব খবরই রাখেন দেখছি?'

'রাখতে হয়। যাক,' বাম কাঁধে ঝোলানো একটা ক্যামেরা তুলে ধরল ম্যাখারভ রানার চোখের সামনে। 'এটার নাম গেইজার কাউন্টার। ইউরেনিয়াম আবিষ্কারে একটা অপরিহার্য জিনিস। আপনি ইয়টে যাচ্ছেনই যখন, দয়া করে এটা নিয়ে যান সাথে। খুবই সহজ ব্যাপার, কাঁধে থাকবে এটা, হাতে থাকবে ঘড়ির মত দেখতে এই মিটারটা।' ঘড়ি খুলে ফেলল ম্যাখারভ কব্জি থেকে। 'এই ঘড়ি থেকে দুটো তার বেরিয়ে প্রবেশ করেছে ক্যামেরার মত দেখতে এই বাক্সটার মধ্যে। এর ভেতর আসলে ব্যাটারি, একটা মেটাল ভাল্‌ভ্ আর একটা সার্কিট আছে। আর এই হচ্ছে সুইচ। যদি

ওই ইয়টে বোমাটা থাকে তাহলে মিটারের এই কাঁটা পাগলামি আরম্ভ করে দেবে। রেডিও অ্যাকটিভ র‍্যাডিয়েশন শো করবে এই মিটারে পরিষ্কার। আমার যতদূর বিশ্বাস এই বোমা চুরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইয়াকুব বে-র এবং অচিরেই আপনারাও জড়িয়ে পড়বেন ঘটনার আবর্তে। বোমাটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে এই সাহায্যটুকু করবেন না আপনি আমাদের?'

'শুধু যদি এইটুকুই সাহায্য চান, আমার আপত্তি নেই। দিন ফিট্ করে দিন, আর কিছু বলবার নেই তো?'

'না। আর কিছু বলবার নেই। শুধু এইটুকু বলব—সাবধান থাকবেন। গত তিনমাস আপনাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা দেখে এবং কার্যকলাপ অনুসরণ করে চোখ খুলে গেছে আমাদের। আপনাদের ছোট করে দেখবার ধৃষ্টতা নেই আমার। কিন্তু তবু বলছি, প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা দলের বিরুদ্ধে লেগেছেন আপনি। যত কৌশলই করেন আপনার বর্ম ভেদ করে আসল চেহারা বের করে ফেলতে ওদের খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।'

যন্ত্রটা রানার কব্জিতে ফিট্ করে দিয়ে রাবার স্যুটটা পরতে সাহায্য করল ম্যাখারভ রানাকে। ওর পিঠে তুলে দিল কম্প্রেস্‌ড্ এয়ারের সিলিন্ডার। দুই পাটি দাঁতের মাঝখানে রাবারের মাউথপিস লাগিয়ে নিয়ে ভাল্‌ভ্ রিলিজটা অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা যাতে পরিমাণ মত বাতাস আসে। তারপর সাপ্লাই বন্ধ করে মাউথপিস বের করে নিল মুখ থেকে।

'এদিকের সমুদ্র সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে? কি ধরনের জীব-জন্তুর সঙ্গে দেখা হবে? হার্পুন তো নিলাম না, হাঙর-টাঙর আছে?'

'হাঙর আছে, কিন্তু কম। এক আধটা ব্যারাকুডার সাক্ষাৎ মিলতে পারে। সাধারণত রাত্রিবেলা ভরপেট খেয়ে-দেয়ে ওরা অলস হয়ে পড়ে। ওরা বিরক্ত করবে না, অবশ্য যদি জখম না হন। রক্তের স্বাদ পেলেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওদের। এছাড়া কাঁকড়া, চিংড়ি বা এক আধটা অক্টোপাসের বাচ্চা দেখতে পাবেন। বৃষ্টি না হলে পানি খুব পরিষ্কার থাকে, বৃষ্টি হলেই ঘোলা পানি পড়ে ঘোলাটে হয়ে যায়। তেমন কোনও অসুবিধা হবে না, চাঁদের আলো পাবেন নিচে। মৃদু একটু বাতাসও আছে—অ্যাকুয়া লাং-এর বুদবুদ দেখতে পাবে না কেউ ইয়ট থেকে। আমি থাকলাম এখানে বসে আপনার জন্যে। বড় জোর ঘণ্টা খানেক লাগবে আপনার ফিরে আসতে—আমি আছি ততক্ষণ।'

'বেশ, দেখা হবে। আসি তাহলে।' কোমরে হাত দিয়ে ছুরিটা অনুভব করল রানা একবার। মাউথপিস দাঁতে চেপে ধরে এয়ার সাপ্লাই খুলে দিল, ফ্লিপার লাগিয়ে নিল পায়ে, তারপর মাস্ক পরে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল

পানিতে। সোজা হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল সে পানির তলায়।

ষাট ফুট আন্দাজ নেমে থামল রানা। ছোট ছোট ঢেউয়ের ছাত গলে সমুদ্রের নিচে বিছিয়ে পড়েছে দ্বাদশী চাঁদের ম্লান আলো। অসমান সাগর তলে ভৌতিক আলোছায়া। ঘড়ির দিকে চাইল রানা। বারোটা বাজে। দিকটা ঠিক করে নিয়ে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল সে। মাটি থেকে তিন ফুট উঁচু দিয়ে সহজ স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে চলল সে।

আলকাতরার ড্রাম, শিশি-বোতল, মোটর-টায়ার, ইত্যাদি নানান রকমের জিনিস চোখে পড়ল ওর। সামুদ্রিক ফুল ফুটে আছে জায়গায় জায়গায়। একটা খয়েরী রঙের ছোট্ট অক্টোপাসের বাচ্চা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার গতির কম্পন টের পেয়েই, সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল একটা ক্যানেস্তারার মধ্যে। রানা বুঝল ওটাই ওর বাড়ি। গেলাটিনাস পলিপ্স্ বলে এক রকম রাত্রিকালীন সামুদ্রিক ফুল নিশ্চিন্তে বিকশিত হয়েছিল বালুর আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে—রানার ছায়া পড়তেই চট্ করে ঢুকে পড়ছে গর্তের ভেতর। কাঁকড়াগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে। আরও কত শত নাম-না-জানা সামুদ্রিক কীট পিচকারীর মত রঙ ছড়াচ্ছে রানার দিকে, জায়গাটা অন্ধকার করে ফেলে ধুলো দেবার চেষ্টা করছে রানার চোখে, পাছে ধরে খেয়ে ফেলে সে ওদের। রানাকে এক ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করেছে ওই সব ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীগুলো। হাসি পেল রানার। অদ্ভুত এক জগতে এসে হাজির হয়েছে যেন সে। অদ্ভুত এদের চালচলন, অদ্ভুত এদের জীবনযাত্রা। সবকিছু মন দিয়ে লক্ষ করছে রানা; যেন এইসব দেখবার জন্যেই নেমেছে সে এই শীতের রাতে সাগর তলে। আসলে রানা জানে, এছাড়া সমুদ্রের নিচে মাথা ঠিক রাখার আর কোনও উপায় নেই। এইসবের মধ্যেই মনটাকে ব্যস্ত রাখতে হবে, নইলে কাল্পনিক ভয় এসে পঙ্গু করে ফেলবে ওর চলৎশক্তি, চোখ দুটো সব সময় খুঁজবে ধূসর পর্দাটার ওপারের কোনও কাল্পনিক দৈত্য। ওর চারপাশেই বিশ হাত দূরে রয়েছে সে পর্দাটা, ঘিরে রেখেছে ওকে গোল হয়ে, ও এগোলে পর্দাটাও এগোচ্ছে সাথে সাথে—তার ওপাশে কি আছে দেখবার উপায় নেই।

চাঁদটাকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছে রানা স্বচ্ছন্দ গতিতে। আবু তাহেরের কথা মনে পড়ল ওর, যোরার কথাও। গত পরশু রাতে বন্দী হবার পর যোরার ছায়াও আর দেখতে পায়নি রানা। গতকাল আবু তাহের বাইরে গিয়েছিল ঘণ্টা তিনেকের জন্যে, রানা আশা করেছিল আসবে যোরা কোনও ছুতো ধরে। কিন্তু না, আসেনি সে, কিংবা আসতে পারেনি। আচ্ছা! হঠাৎ চমকে উঠল রানা। ইয়াকুব বে জানে, লেনিন M-315 চুরি হবার সাথে সাথে

তৎপর হয়ে উঠবে ইস্তাম্বুলের কেজিবি এজেন্ট। তারা নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে ম্যাখারভের কার্যকলাপের ওপর। তাহলে? সব ফেঁসে গেল না তো? ওরা যদি ম্যাখারভকে অনুসরণ করে থাকে তাহলে ওর নিজের অবস্থাটা কি দাঁড়াল? সে-ও কি ধরা পড়ে গেল ম্যাখারভের বোকামিতে? মন থেকে দূর করে দিল রানা এই দুশ্চিন্তা। যা হবার হবে—অত ভেবে লাভ নেই এখন।

কালো একটা ছায়া দেখতে পেল রানা সামনে। এই ছায়াটাকে বামে রেখে এগোতে হবে ওকে। এটা আরসিডি শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের তৈরি প্রথম জাহাজ এম.ভি. রুস্তমের ছায়া। আগামীকাল সকাল এগারোটায় রওনা হবে এটা করাচির উদ্দেশে। এথেন্স বন্দরে কিছু যাত্রী ও মাল নামিয়ে সুয়েজ ক্যানেল দিয়ে চলে যাবে করাচি। মাঝে মাত্র তিনটে স্টপেজ। এথেন্স, পোর্ট সাইদ আর এডেন বন্দর। তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তানের যৌথ অর্থে তৈরি হয়েছে এই জাহাজ, প্রথম জাহাজটা পাচ্ছে পাকিস্তান। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ কি মনে করে জাহাজটার কাছে সরে এল সে। গেইজার কাউন্টার-এর সুইচ অন্ করে ধরল যন্ত্রটা জাহাজের গায়ের সাথে। কব্জিতে বাঁধা মিটারের দিকে চাইল সে। না। নিশ্চিন্ত হলো রানা। বোমাটা এই জাহাজে নেই। আবার এগোল সে। পা দুটো মেশিনের মত চলছে। আর বেশি দূর নেই ইয়টটা। ইয়াকুবের ইয়ট। হেন দুষ্কর্ম নেই যা সে এই ইয়টের সাহায্যে করেনি।

সেই আদিমকাল থেকে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ বিপদে পড়েছে তার থেকে উদ্ধারের পথও বের করে নিয়েছে; ভয় পেয়েছে, জয় করেছে সে ভয়কে। তখন ছিল পদে পদে ভয়—ধীরে ধীরে কমে এসেছে মানুষের বিপদ আর ভয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সেই আদিমকালের জংলী-মানুষের অস্থিমজ্জার ভেতর যে বোধ একবার ঢুকেছে সেটা নিজের অজান্তেই পরবর্তী মানুষ বহন করে চলেছে বংশ পরম্পরায়। বিশেষ করে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তার দেহের মধ্যেকার কোন্ স্নায়ু যে তাকে বিপদ সঙ্কেত দিয়ে সতর্ক করে দেয় সেটা নিয়ে আজও গবেষণা হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে। নানান চিন্তার মধ্যেও রানার অবচেতন মন হয়তো সজাগ ছিল, হঠাৎ চমকে উঠল সে বিপদসঙ্কেত পেয়ে। তার ভিতর থেকে কে যেন পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ করল—সাবধান!

চট করে ডান হাতটা চলে গেল ওর কোমরে ঝোলানো ছুরির কাছে। নিজের অজান্তেই দ্রুত ডান দিকে ফিরল সে। বাঁয়ে নয়।

ব্যারাকুডা। সমুদ্রের সবচেয়ে হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রাণী। ফুট আষ্টেক লম্বা,

ওজন সের ত্রিশেক হবে। কিন্তু এক কথায় ভয়ঙ্কর। প্রকাণ্ড চোয়ালের মধ্যে আছে দুই সারি ক্ষুরধার দাঁত—দেহটা রূপালী-নীল; সমুদ্রের সবচেয়ে দ্রুতগামী পাঁচটি জীবের মধ্যে একটি। দশ গজ ডাইনে রানার সমান্তরালে আলস্যভরে চলেছে সেটা ওর সাথে সাথে। লালচে নিরুৎসুক চোখে পরীক্ষা করছে সে রানাকে। নিচের চোয়ালটা ইঞ্চি খানেক ঝুলে পড়ায় চকচকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। এই দাঁত কামড় দেয় না—বিদ্যুৎগতিতে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর মত এক চাঁই মাংস তুলে নিয়ে দূরে সরে যায়, সেটা গিলে নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বিগুণ উৎসাহে।

ভয় পেল রানা। পাকস্থলীতে সুড়সুড়ি জাতীয় একটা অনুভূতি হলো ওর। নিজের অজান্তেই পেশীগুলো টান হয়ে গেল। একটানে ছুরিটা বের করে নিয়ে সোজা এগোল রানা ওটার দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। শক্তিশালী লেজটা বার কয়েক এদিক-ওদিক দুলিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মাছটা ধূসর পর্দার ওপারে। রানা নিজের গতিপথে আবার চলতে আরম্ভ করতেই আবার ফিরে এল সেটা। সেই একই দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে সে রানাকে, রানার ক্ষমতা ওজন করে দেখছে যেন সে দাঁড়িপাল্লায়— হয়তো মনে মনে প্রথম আক্রমণ করবার জন্যে একটা পছন্দসই জায়গা বেছে বের করবার চেষ্টা করছে।

প্রমাদ গুণল রানা। সামুদ্রিক মাংসাশী জীবজন্তু সম্পর্কে ওর বিশেষ কোনও জ্ঞান নেই। কিন্তু এটা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, ভয় পেলে চলবে না। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে ঘোড়া ও কুকুর যেমন টের পায়, তেমনি এরাও টের পায় কিনা কে জানে। আতঙ্কিত গতিবিধি টের পেলে ও বুঝে নেবে কে শিকারী আর কে শিকার। সেটা ওকে বুঝতে দিলে চলবে না। শান্ত স্বাভাবিক ভাবে চলতে হবে, যেন ব্যারাকুডার উপস্থিতি কিছুমাত্র চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারেনি ওর মধ্যে। স্বচ্ছন্দে চলছে সে নিজের কাজে—ওসব আজেবাজে জন্তু জানোয়ারের পিছনে নষ্ট করবার মত সময় নেই। ছন্দোবদ্ধ ব্যবহারকে একমাত্র বর্ম বানিয়ে চলল এগিয়ে নির্ভীক রানা। ভিতরে ভিতরে হার্ট বিট ওর একশো চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে।

একরাশ সামুদ্রিক ঘাসের ওপর দিয়ে চলেছে রানা এখন। মৃদু স্রোতে দুলছে ঘাসগুলো। এই সম্মোহনী দোলা দেখতে দেখতে মাথাটা কেমন গুলিয়ে এল ওর। ঘাসের ওপর ভাঙাচোরা ভাবে রানার ছায়া পড়ছে। কয়েক গজ তফাতে ওর সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে আরেকটা লম্বা ছায়া—ছায়া তো নয়, ব্যারাকুডার বিভীষিকা। নির্দিষ্ট ছন্দোবদ্ধ গতির কাল্পনিক বর্মে নিজেকে আবৃত করে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে রানা। মাঝে মাঝে চোখ পাকিয়ে

তাকাচ্ছে সে রুপোলী জন্তুটার দিকে—প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে ওর চেয়েও বড় এবং ভয়ঙ্কর মাছ সে একটা, নির্বোধের মত আক্রমণ করে বসা ঠিক হবে না।

হঠাৎই ইয়টের নোঙ্গর দেখতে পেল রানা। মাটি ফুঁড়ে যেন একটা শিকল উঠে চলে গেছে উপর দিকে। ব্যারাকুডার কথা ভুলে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে আরম্ভ করল সে শিকল ধরে। চাঁদের আলো ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসছে। জাহাজের খোলটা ধীরে ধীরে নিজ আকৃতি ধারণ করছে। চারপাশে চাইল রানা। ব্যারাকুডার চিহ্নও নেই। উঠে এল সে অনেকখানি। পিছিয়ে গেল বেশ খানিকটা। ইয়টের পিছন দিক দিয়ে উঠতে হবে ওপরে।

ইটালীর লিওপোল্ডো রড্রিগস্ কোম্পানী একশো টনের এই সুদৃশ্য ইয়টটাকে অতি যত্নের সঙ্গে শার্টেল-স্যাকসেনবার্গ সিস্টেমে তৈরি করেছে। 'আলিসকাফোস' বলে ওরা একে। হাইড্রোফয়েল ক্র্যাফট্। অ্যালুমিনিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়ের তৈরি খোলটা। দুটো ফোরস্ট্রোক ডেইমলার বেঞ্জ ডিজেল এঞ্জিন—টুইন ব্রাউন বোভারি টার্বো সুপারচার্জার ফিট্ করা। পঞ্চাশ নট্ পর্যন্ত স্পীড—টপ্ স্পীডে ক্রুজিং রেঞ্জ চারশো মাইল। দুই লক্ষ পাউন্ড খরচ হয়েছিল ইয়াকুবের এটা তৈরি করতে। ইস্তাম্বুলের দর্শনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে এটাকেও ইদানীং গণ্য করা হয়। সব তথ্যই রানার জানা।

উপরে উঠে দেখলেও চলত, কিন্তু দেরি সহ্য হলো না রানার। পানির নিচেই ইয়টের গায়ে সেঁটে গিয়ে বোতাম টিপল সে গেইজার কাউন্টার-এর। মিটারের দিকে চেয়েই চমকে উঠল রানা। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন একটা কাঁটা! পাগলের মত লাফালাফি করছে!

তাহলে ঠিকই বলেছিল ম্যাখারভ! লেনিন M-315 চুরি করে এনে এখন এই ইয়টের মধ্যে রাখা হয়েছে। ওটা তাহলে ইয়াকুব বে-রই কাজ। এক্ষুণি খবরটা ম্যাখারভকে দেয়া দরকার। কিন্তু যে কাজে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ করা দরকার তারও আগে। ইয়টে উঠতে হবে—ইয়াকুব বে-র কেবিনে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে একটা জিনিস। ওটা পাওয়া গেলেই সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে এক মুহূর্তে।

যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে এগোতে যাবে রানা, ঠিক এমনি সময়ে ঠং করে একটা শব্দ হলো কানের পাশে। বাম কাঁধের ওপর কিসের যেন বাড়ি লাগল। চমকে উঠে জাহাজের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে সরে গেল রানা। চোখে পড়ল তীক্ষ্ণ একটা বর্শা তলিয়ে যাচ্ছে নিচে! ঝট্ করে ঘুরল রানা। ঘুরেই দেখতে পেল কালো রাবার স্যুট পরা একজন লোক দ্রুত নেমে আসছে নিচে। ওর হাতে ধরা হার্পুন গানে আরেকটা বর্শা ভরা হয়ে গেছে। পাগলের মত পা

চালিয়ে ছুটল রানা ওর দিকে। হার্পুনের লোডিং লিভারটা পিছনে টেনেই রানার দিকে তাক করল লোকটা। রানা বুঝল সময় নেই, এখনও ছয় হাত ওপরে আছে লোকটা—সময় মত পৌঁছতে পারবে না ওর কাছে গিয়ে। হঠাৎ থামল সে। তারপর মাথা নিচু করে ডিগবাজি খেল একটা। স্টীলের পাত বসানো জুতোর তলায় এসে লাগল বর্শাটা। এইবার! দ্রুত উঠে এল রানা। ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল লোকটার পাঁজরে। এমনি সময় হার্পুনের বাঁটটা এসে পড়ল ওর মাথার ওপর, রানার এয়ার পাইপ খুলে ফেলবার চেষ্টা করছে লোকটা একহাতে। দিশেহারার মত ছুরি চালাল রানা। পানির মধ্যে নড়তে চাইছে না হাত। একবার, দুইবার, তিনবার! ছুরি চালানোয় কাজ হলো। মাস্ক ছেড়ে দিল হাতটা। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা আর। আবার রানার মাথার ওপর এসে পড়ল হার্পুনের বাঁট। ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথাটা। পানিটা ঘোলা হয়ে গেছে—ঘন কালো ধোঁয়ায় যেন ভরে গেছে চারদিক। মাস্কের কাঁচে লেগে গেছে কালচে মত কি যেন আঠাল জিনিস। সরে গেল রানা পিছনে। পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছে সে কাঁচটা হাত দিয়ে ঘষে। আবার দেখতে পাচ্ছে রানা। কালো ধোঁয়াটা আসলে বেরোচ্ছে লোকটার পেট থেকে—গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আবার হার্পুন তুলল লোকটা অনেক কষ্টে, ধীরে ধীরে—যেন দশ মণী কোনও ওজন তুলছে। চক্‌চক্ করছে বর্শার ফলাটা। পা নড়ছে না লোকটার আর। ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে সে। রানাও নামছিল, সতর্ক হয়ে গিয়ে হাত পা নাড়বার চেষ্টা করল সে। ওর হুকুম আর পালন করতে চাইছে না ওর দেহের অংশগুলো—লোহার মত ভারি হয়ে গেছে যেন সেগুলো। মাথা ঝাড়া দিল রানা একবার।

লোকটা চারহাত তফাতে রানার দেহ বরাবর নেমে এল। রাবার মাউথপিস কামড়ে ধরে আছে—কিন্তু দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কুঁচকে বিকৃত হয়ে গেছে সারা মুখ। হার্পুনটা এখন সোজা রানার বুকের দিকে ধরা। হাত দিয়ে আড়াল করল রানা বুকটা, কিন্তু পায়ে যেন কিছুতেই শক্তি পাচ্ছে না সে।

হঠাৎ লোকটার দেহটা সামনের দিকে এগিয়ে এল একবার। কেউ যেন প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরেছে ওর পিঠের ওপর। খসে পড়ে গেল হার্পুন ওর হাত থেকে। লোকটার পিঠের দিক থেকে আবার একরাশ ধোঁয়া বেরোল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো ওপরে তুলল লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল আচমকা এই আঘাতটা এল কোত্থেকে।

রানা চেয়ে দেখল কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভয়ঙ্কর ব্যারাকুডা। বেশ খানিকটা কালো রাবার ঝুলছে ওর চোয়ালের ফাঁকে। আট

ফুট লম্বা একটা রুপোলী-নীল টর্পেডো যেন। পানিতে রক্তের গন্ধ পেয়ে আর লোভ সংবরণ করতে পারেনি সে, আক্রমণ করে বসেছে বিনা দ্বিধায়।

রানার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চাইল সে একবার, তারপর মাথা নিচু করে দেখল আহত লোকটাকে। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে দেহটা। প্রকাণ্ড হাঁ করে মাথা ঝাড়া দিয়ে রাবারের অংশগুলো ঝরিয়ে ফেলল সে, ধীরে সুস্থে ঘুরে দিক পরিবর্তন করল। তারপর সর্বদেহে একটা শিহরণ তুলে বিজলীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাঁ করে লোকটার ডান কাঁধের ওপর গিয়ে পড়ল ব্যারাকুডা প্রচণ্ড বেগে। একবার কেঁপে উঠল লোকটার দেহ, তারপর পিছিয়ে গেল আবার কিছুটা। একতাল মাংস অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটার কাঁধ থেকে। চোখের সামনে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠল রানার অন্তরাত্মা। নিজের অজান্তেই সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেছে সে দূরে সরে যাবার জন্যে। যেন স্বপ্নের ঘোরে আছে সে এখন।

কয়েক গজ এগোতেই রানার বাম ধারে টুপ করে কি যেন পড়ল। চাঁদের আলোয় চক্চক্ করে উঠল ডিমের আকৃতি ছোট্ট জিনিসটা। ডুবে যাচ্ছে সেটা পানির তলায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এগোতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল সে আড়াআড়ি ভাবে। ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে ফিরে এল রানা। দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে চলল এবার সে সামনের দিকে—সেই সঙ্গে নেমে যাচ্ছে সাগর-গভীরে। আরও কয়েকটা গ্রেনেড পড়ল, কিন্তু নিচে চলে আসায় বিস্ফোরণের ধাক্কাটা কমে গেছে।

তলায় পৌঁছে গেল রানা দুই মিনিটেই। তেমনি দুলছে ঘাসের গুচ্ছ। এখন ইয়টের সবাই সতর্ক হয়ে গেছে, এখন আর ওটাতে ওঠার কোনও উপায় নেই। সর্বশক্তি দিয়ে সাঁতরে চলল রানা। এখন যে-কোন মুহূর্তে বোট নামিয়ে খোঁজ করবে ওরা পানি লাল হয়ে ওঠার কারণ। ফিরে যেতে হবে ওকে, খবর দিতে হবে ম্যাখারভকে, তারপর এরা টের পাওয়ার আগেই গিয়ে ঢুকতে হবে নিজের কুঠুরিতে। রানাই যে হার্পুনধারী লোকটাকে খুন করেছে সেটা ওরা টের পাবে না, রানার আগমন টের পাওয়ার তেমন কোন কারণও নেই। ওরা মনে করবে লোকটা হাঙর বা ব্যারাকুডার হাতেই মারা গেছে।

ঘাসের কার্পেট ছাড়িয়ে চলে এল রানা। মাথাটা ব্যথা করছে। এখনও ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথার ভেতর হার্পুন গানের বাঁটের ঘা খেয়ে। পানির মধ্যে বলেই রক্ষা পেয়েছে সে, নইলে এক বাড়িতেই ছাতু হয়ে যেত ওর মাথাটা।

অক্টোপাসের বাচ্চাটা আবার সাহসে ভর করে অতি সন্তর্পণে বেরিয়েছিল ক্যানেস্তারার মধ্যে থেকে। আবার রানাকে আসতে দেখেই স্যাৎ করে ঢুকে পড়ল। সারারাত আর বেচারা বেরোবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারবে

না।

আলকাতরার ড্রাম পর্যন্ত এসে থামল রানা। তারপর ডান দিকে ঘুরে উঠে আসতে আরম্ভ করল ওপরে। এতক্ষণের একটানা পরিশ্রমের পর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর বুকের ভিতর। টিপ-টিপ করছে কপালের দুই ধার। ধীরে ধীরে মাথা তুলল রানা পানি থেকে।

আগুন! প্রথমেই রানার চোখে পড়ল আগুন। অবাক হয়ে দেখল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে লাল ওপেল রেকর্ডে। নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে। ম্যাখারভের ওপর ইয়াকুব বে-র হামলা নয় তো? অপেক্ষা করবে বলেছিল—ম্যাখারভ কি এখনও আছে ওই ছাপড়ার মধ্যে?

ধীরে ধীরে উঠে এল রানা। উঁচু পাহাড়ের আড়ালে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল নীরবে। খুলে ফেলল অ্যাকুয়ালাং আর ফ্লিপার। তারপর সাবধানে বুকে হেঁটে এগোল ছাপড়ার দিকে। কোনও শব্দ নেই। দেয়ালে কান পেতেও কোনও সাড়াশব্দ পেল না রানা ঘরের ভিতর। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ লাফিয়ে ঢুকল ঘরের ভিতর উদ্যত ছুরি হাতে।

ঘরের মাঝখানটায় চিত হয়ে পড়ে আছে ম্যাখারভের মৃতদেহ। বুকের ওপর দুটো জায়গায় সাদা শার্ট লাল হয়ে গেছে।

সাত

তাহলে? খবরটা দেয়া হলো না ম্যাখারভকে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল রানা ছাপড়ার মধ্যে থেকে। তেমনি উচ্ছ্বসিত আবেগে তীরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সী অভ মারমারার ঢেউ। চাঁদটা ঢেকে গেছে মেঘে। ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়ায় সোঁদা একটা গন্ধ। খুব সম্ভব বৃষ্টি নামবে। দ্রুত ফিরবার তাগিদ অনুভব করল সে। এই শীতের রাতে বৃষ্টিতে ভিজে গেলে মহা বিপদ হবে। তিন মাইল হাঁটতে হবে এখন। পথ চলতে চলতে চিন্তা করা যাবে। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোল রানা।

ম্যাখারভকে হত্যা করবার কারণ কি? ও অনেকখানি জেনে ফেলেছে সেজন্যে? যারা ওকে খুন করল তারা কি রানাকে দেখতে পেয়েছে? খুব সম্ভব না। তাহলে ম্যাখারভকে শেষ করেই কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করে ফিরে যেত না—রানার জন্যে অপেক্ষা করত। এমনও অবশ্য হতে পারে ইয়টের

লোকদের সাবধান করে রানাকে ওদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেছে ওরা। কিন্তু এমন হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাহলে অন্তত শেষ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করত ওরা। আড়ালে আবডালে কোথাও সত্যি সত্যিই কেউ অপেক্ষা করে আছে কিনা কে জানে। কিছুই বলা যায় না। ঠিকই বলেছিল ম্যাখারভ, এ শত্রু বড় ভয়ঙ্কর। চকিতে একবার চারপাশে চাইল রানা। না, জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই আশে-পাশে। ফাঁকা রাস্তার সারি-সারি ল্যাম্প পোস্টগুলো পরস্পরের সঙ্গে অনেক বাঁধনে বাঁধা, তবু কেন যেন বড় নিঃসঙ্গ লাগল রানার ওদের প্রত্যেকটিকে। দীর্ঘ পদক্ষেপে ছাড়িয়ে গেল একটির পর একটি। বিদ্যুৎ চমকে উঠল একবার আকাশ চিরে।

না, কেউ অনুসরণ করছে না। নিশ্চিন্ত হলো রানা। এখন দ্রুত ফিরে যেতে হবে ওকে। আজ রাতের ঘটনা হয় এতক্ষণে জেনে ফেলেছে, নয়তো অল্পক্ষণেই জানতে পারবে ইয়াকুব বে। কোনও কারণে ও যদি হঠাৎ রানার কুঠুরিতে যায়, তাহলে সবকিছু ফেঁসে যাবে। কিন্তু বোমার খবরটা যে-করে-হোক জানাতে হবে রাশিয়ানদের। কোথায় জানাবে? ওদের আস্তানা জানা নেই রানার। আচ্ছা, টেলিফোনে টার্কিশ পুলিশকে জানালে কেমন হয়? পথের পাশে টেলিফোন বুদে ঢুকে পড়ল রানা, কিন্তু পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঙতি পয়সা পেল না। ম্লান হাসি হেসে অগত্যা বেরিয়ে এল সে আবার।

হঠাৎ ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামল। তীরের মত বিঁধছে এসে রানার চোখে-মুখে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা। আধ মিনিটেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল জামা-কাপড়। ঘাড় বাঁকিয়ে মাথাটা একটু নিচু করে এগিয়ে চলল সে বৃষ্টির মধ্যে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে।

মনে মনে সবটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখল রানা। বোমার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই কিন্তু ওর কাছে ওর নিজের কাজ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাল কোনও সুযোগে ওদের কাছে খবরটা পৌঁছে দিলেই হবে। এখন ফেরা দরকার।

অনেকখানি ঘুরে হাসান খলীলের বাড়ির পিছন দিকের পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তেমনি ঝুলছে রশিটা। অনায়াসে রশি বেয়ে উঠে গেল রানা ওপরে। খুলে নিল ডালে বাঁধা রশি। নিঃশব্দে নেমে এল সে গাছ বেয়ে পাঁচিলের এপাশে। বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। যাক, ভালই হয়েছে, ওর পায়ের শব্দ টের পাবে না কেউ।

একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল রানা রশিটা। তারপর এগিয়ে গেল কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। পাঁচিলের পরে আরেকটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে বাড়িটাকে। আবু তাহের বলে দিয়েছে: খবরদার, ওপরের

তারটা ছুঁয়ো না, ওতে কারেন্ট আছে। ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে সবচেয়ে নিচের কাঁটাতারটা ওপর দিকে ঠেলে ধরে চলে এল রানা বেড়ার এপাশে। মালীর ঘরটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে কয়েকটা ড্যালিয়া, জিনিয়া আর কস্‌মস্ ফুলের বেডের দিকে। সঙ্গে একটা পেন্সিল টর্চ আছে অবশ্য, কিন্তু জ্বালতে সাহস হলো না ওর। সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রতিটা পদক্ষেপ আন্দাজের ওপর ফেলতে হচ্ছে ওকে। পিচ্ছিল মাটিতে দু'বার পা পিছলে গেল ওর, একবার একটা গর্তে পড়ে মচকেই যাচ্ছিল ডান পা-টা। কস্‌মস্ ফুলের বেড পেরিয়ে গেলে বাড়ির সঙ্গে লাগা একঝাড় বাটন্ ফ্লাওয়ারের বেড। ওরই পাশ দিয়ে বাড়ির পিছন দিকের দরজা। ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে ওকে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে আঁৎকে ওঠা ঘোড়ার মত থম্‌কে দাঁড়াল রানা। স্যাৎ করে সরে গেল মোটা একটা গাছের আড়ালে। খুব কাছেই কথা বলে উঠেছে একজন লোক। উত্তরটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। গলাটাও চিনতে পারল সে। কোহেনের কণ্ঠ।

'ও কিছু নয়। বৃষ্টির মধ্যে ব্যাঙের ডাক। তোমার কাজ তুমি করো।'

'ওস্তাদ, আমি যেন স্পষ্ট শুনলাম! কে যেন "খুক" করে কেশে উঠল।'

ভয়ে হিম হয়ে গেল রানার বুকের ভিতরটা। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করল ওর। নিশ্চিন্ত মনে খুক করে সত্যিই কেশেছিল ও! উৎকর্ণ হয়ে শুনবার চেষ্টা করল সে কোহেনের উত্তর।

'শুরু থেকেই তো নানারকম শব্দ শুনছ তুমি। ভূতের ভয় আছে নাকি হে? কই আমি তো কোনও আওয়াজ পেলাম না। তোমার কাজ তুমি করো। জলদি হাত চালাও।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কি কাজ করছে দেখবার জন্যে মুখ বাড়াল রানা গাছের পাশ দিয়ে। প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না সে, খানিক পরে আবছা কয়েকটা মূর্তি দেখতে পেল। ডালিয়া বেডের পাশে একটা বেড তৈরি করেছিল মালী মাটি খুঁড়ে, কিন্তু এখনও কোন ফুল গাছ লাগানো হয়নি তাতে। সেই খালি বেডের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে ওরা। কি করছে বোঝা গেল না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে। টর্চ জ্বলে উঠল একজনের হাতে। কোদাল। কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে রেনকোট ও গামবুট পরা দু'জন লোক। এতরাতে এই বৃষ্টির মধ্যে মাটি কোপাচ্ছে কেন? একটা বিশ্রী আশঙ্কা উঁকি দিল রানার মনে। মাথা ঝাড়া দিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিল সে। নিভে গেল টর্চটা। আরও মিনিট দু'য়েক পার হয়ে গেল। তারপর আবার

কোহেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'হয়েছে। এতেই হবে। এবার নিয়ে এসো।'

কাজ বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল দু'জন লোক, তারপর বাটন ফ্লাওয়ার বেডের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর। দরজাটা খুলতেই এক ঝলক আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরের বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারে।

ডান পায়ের ওপর থেকে দেহের ভারটা বাঁ পায়ের ওপর আনল রানা। টপ্ টপ্ করে এক-আধটা বড় বড় পানির ফোঁটা পড়ছে গাছের পাতা থেকে রানার মাথার ওপর। বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমেছে বলে মনে হলো। ভয়ানক শীত করছে ওর—ঠক ঠক করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

আধ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল লোক দু'জন। লাইটের আলোয় দেখল রানা লম্বা একটা কাঠের বাক্স বয়ে নিয়ে আসছে ওরা। বেশ ভারি মনে হলো বাক্সটা। দু'জন দু'দিকে ধরেছে, খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে সাবধানে পা ফেলছে ওরা। আবার সেই বিশ্রী আশঙ্কাটা উদয় হলো রানার মনে। এবার আর চেষ্টা করেও তাড়াতে পারল না সে চিন্তাটাকে মাথা থেকে। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সেইদিকে। গায়ে চিমটি কাটল—স্বপ্ন দেখছে না তো?

সদ্য তৈরি করা গর্তের মধ্যে বাক্সটা নামিয়ে দিল ওরা। তারপর কোদাল দিয়ে টেনে মাটি ভরতে আরম্ভ করল। বাড়তি মাটিগুলো চারপাশে সমান ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সবাই মিলে চলে গেল ওরা মালীর যন্ত্রপাতি রাখবার ঘরটার দিকে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে ওর।

তিনজন লোক ঢুকে গেল দরজা দিয়ে। ভিড়িয়ে দিল দরজাটা ভিতর থেকে। কিন্তু একচুল নড়ল না রানা। ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে। সেই সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া। হাড়ের ভেতর যেন প্রবেশ করছে গিয়ে বাতাসটা। দেহের কাঁপুনি বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হলে বিপদ হতে পারে, তাই পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে ভরেছে সে। ছুটে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে ওর বাক্সের ভিতর কি আছে—কিন্তু একচুল নড়ল না রানা।

দশ মিনিট চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। অসময়ে বৃষ্টি পেয়ে এক আধটা ব্যাঙ আনন্দ প্রকাশ করছে থেকে থেকে—ক্যাঁকোঁ···ক্যাঁকোঁ। বাক্সের মধ্যে কি আছে দেখে তারপর কর্মপন্থা স্থির করতে হবে ওকে। ক্লান্তি বোধ করছে রানা। মনে হচ্ছে দেহের ওজন বেড়ে গেছে দশগুণ—পা দুটো ওকে আর বহন করতে পারবে না বেশিক্ষণ। বাম ধারের একটা কামরার ভেন্টিলেটার দিয়ে সামান্য এক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছিল, নিভে গেল সেটা শুয়ে পড়ল বোধহয় সেই তিনজন লোক। কিন্তু তবু একচুল নড়ল না রানা।

আরও দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল সে। মোটা গাছের কোনও একটা ফোকরের মধ্যে থেকে হঠাৎ জোরে ডেকে উঠল একটা তক্ষক সাপ। চমকে উঠল রানা। বোধহয় চমকে উঠেছিল কোহেনও। থুক্ করে থুথু ফেলার শব্দ পাওয়া গেল, তারপর কাছেই একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। টর্চ জ্বেলে শেষ বারের মত পরীক্ষা করল সে, ওখানে যে কিছু পুঁতে রাখা হয়েছে সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে কিনা। সন্তুষ্ট চিত্তে আবার থুথু ফেলল কোহেন, তারপর ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর দরজা খুলে।

এইবার বেরিয়ে এল রানা গাছের আড়াল থেকে। সোজা চলে গেল মালীর ঘরের দিকে। একটা কোদাল নিয়ে এসে দুই মিনিটের মধ্যে মাটি সরিয়ে খুলে ফেলল বাক্সের ডালাটা। আগেই আঁচ করেছিল যদিও, পেন্সিল টর্চের আলো ফেলেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। আবু তাহেরের লাশ!

বীভৎস বিকৃত রূপ ধারণ করেছে আবু তাহেরের প্রাণবন্ত মুখটা। ডান চোখটা অদৃশ্য হয়ে গেছে—রক্তের একটা ধারা নেমেছে গাল বেয়ে, গোঁফের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে এসে ঠোঁটের কোণে জমে আছে খানিকটা রক্ত। বাম চোখে বিস্ফারিত আতঙ্কিত দৃষ্টি। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে ওকে। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে ওরা আবু তাহেরকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল রানা এখনও পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি দেহটা। ঘণ্টাখানেক আগে ঘটেছে এই হত্যাকাণ্ড।

প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল রানার দুই চোখে। মনে মনে একটা কঠিন শপথ গ্রহণ করল সে। আবু তাহেরের কপালের ওপর থেকে একগুচ্ছ চুল সরিয়ে দিল রানা, তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল ডালাটা। মনস্থির করে ফেলেছে সে।

'কে?' চমকে উঠে বসল মুজাদ্দিদ বিছানার ওপর। হাতটা চলে যাচ্ছিল বালিশের তলায় পিস্তলের কাছে, জ্বলে উঠল রানার হাতে পেন্সিল টর্চ।

'খবরদার! টর্চের পেছনেই প্রস্তুত আছে ছোট্ট একটা যন্ত্র। সাইলেন্সার ফিট করা আছে এতে। হাতটা সরিয়ে আনুন বালিশের কাছ থেকে।'

নিঃশব্দে হাত সরিয়ে আনল মুজাদ্দিদ। একবার ভাবল চিৎকার করবে কিনা। চিনতে পেরেছে সে রানার কণ্ঠস্বর। কিন্তু না, তাহলে গুলি ছুঁড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না খুনী মাসুদ রানা। তার চাইতে দেখাই যাক কি মতলব।

'আপনি বুদ্ধিমান লোক। আপনাকে বেশি কথা বলবার দরকার নেই। কিন্তু তবু বলছি, টুঁ শব্দ করলে খুন হয়ে যাবেন। উঠে পড়ুন বিছানা ছেড়ে,

ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিন।' টর্চের আলোটা বিছানার মাথার কাছে চলে গেল। ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ইলেকট্রিক বাতির সুইচটা টিপে দিয়েছে মুজাদ্দিদ। অবাক হয়ে দেখল সে আপাদমস্তক চুপচুপে ভেজা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র রানা ওর পিস্তলটা বের করে নিল বালিশের তলা থেকে। বুঝতে পারল মুজাদ্দিদ, ঠকে গেছে সে। ভাঁওতা দিয়েছিল রানা, কৌশলে ছিনিয়ে নিল সে ওর পিস্তল।

'এইবার চিৎকার করে লোক ডাকব আমি,' বলল মুজাদ্দিদ মৃদু হেসে। 'তুমি হেরে গেলে, মাসুদ রানা। ওই পিস্তলে একটিও গুলি নেই।'

মৃদু হাসল রানাও। বলল, 'আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই বলেছি। ঠিক আছে, আপনি চিৎকার করুন, আমিও পরীক্ষা করে দেখি গুলি আছে কি নেই।' ক্লিক্ করে সেফটি ক্যাচটা নামিয়ে দিল রানা।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুজাদ্দিদের মুখ। বুঝল, এবারও হেরে গেছে সে। লোকটা সাক্ষাৎ একটা পিশাচ। চিৎকার করবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না ওর মধ্যে। আশ্চর্য হয়ে দেখল ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে চলে এল রানা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। টেবিলের ওপর রাখা রাকির বোতল থেকে দুটো গ্লাস ভর্তি করল সে। হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল। তারপর সেফটি ক্যাচ উঠিয়ে দিয়ে পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল ওর দিকে।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করতে চাই আমি। বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাই আমি আপনার সঙ্গে।'

এবার সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে গেল মুজাদ্দিদ। খপ্ করে শূন্যে ধরে ফেলল সে পিস্তলটা। কয়েক সেকেন্ড লাগল ওর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাতে। আপাদমস্তক দেখল সে একবার রানাকে। তারপর পিস্তলটা বালিশের তলায় গুঁজে রেখে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে।

'একজন খুনী দস্যুর কি আলাপ থাকতে পারে আমার সঙ্গে? কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমি খুনীও নই, দস্যুও নই।' ঢক্ ঢক্ করে নিঃশেষ করল রানা একটা গ্লাস। তারপর নামিয়ে রাখল সেটা টেবিলের ওপর।

'তাহলে? তুমি সাধুপুরুষ? সারা দেশের পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে তোমাকে, মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে তোমার মাথার ওপর, দুই দুইটা খুন করেছ তুমি তুরস্কে, তার ওপর সেদিন কোর্ট-রুমের মধ্যে তিনজনকে মারাত্মক ভাবে জখম করে পালিয়ে গেলে যোরাকে নিয়ে, এসব তাহলে সাধুপুরুষের কাজ?'

'না। একটা জিনিসকে দেখবার বহু রকম দৃষ্টিকোণ আছে। আমি একটা নতুন দৃষ্টিকোণ দিচ্ছি আপনাকে—দেখুন আমার চেহারাটা পাল্টে যায় কিনা।

মনে করুন, আমি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। আমাদের দেশ থেকে আমাকে পাঠানো হলো আরসিডি প্ল্যান অনুযায়ী তুরস্কে যে শিপ বিল্ডিং করপোরেশন আছে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ওপর মাফিয়ার মত কুখ্যাত একটা দস্যুদলের প্রভাব বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করতে। ইস্তাম্বুলে এসে কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি, কাছেও ঘেঁষতে পারলাম না ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা মাফিয়ার লোকদের। তখন আমার পরামর্শে তুরস্ক সরকার আমার বিচারের ব্যবস্থা করলেন কয়েকটি ভয়ঙ্কর অথচ কাল্পনিক অভিযোগ খাড়া করে। বিচারপতির কন্যা প্রায় জোর-জবরদস্তি করে তার বান্ধবী যোরা খলীলকে নিয়ে এল বিচারকক্ষে মজার এক বিচার দেখাবে বলে। তারপরের ঘটনাগুলো আপনি জানেন। এবার কল্পনা করুন আমার চেহারাটা।'

দ্রুত চিন্তা চলছে মুজাদ্দিদের মাথার মধ্যে। খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে সে সমস্ত ঘটনাগুলো। ওকে চিন্তার সুযোগ দিয়ে দ্বিতীয় গ্লাসটাও তুলে নিল রানা টেবিল থেকে।

'তাহলে পুলিস কমিশনার আর কনেস্টেবলকে...'

'রিভলভারের প্রথম গুলি দুটোতে সীসা ছিল না—ফাঁকা আওয়াজ। বাকিটা ওঁদের অভিনয়, আর আলতার কারসাজি।'

'জজের গাড়ির চাকা...'

'হ্যাঁ। ওটা ফুটো করতে হয়েছিল। তার ফলে মানুষের কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'পুলিসের গাড়িটা যখন তাড়া করেছিল...'

'সমস্তটাই অভিনয়। এরপর বলবেন গাড়ি চুরি করেছি—আসলে ওটা আমার জন্যেই রাখা ছিল।'

'আবু তাহের যে বন্দী করল...'

আবু তাহেরের নাম উচ্চারণ হতেই নিজের অজান্তেই মুখটা কঠিন হয়ে গেল রানার। বলল, 'আবু তাহের ছিল আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন।'

'ছিল মানে?'

'মানে ও এখন আর নেই। ওকে হত্যা করা হয়েছে। নিজের চোখে দেখেছি আমি দশ মিনিট আগে ওকে কবর দিতে। টার্কিশ ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক ছিল সে। আমরা দু'জন একসাথে কাজ করছিলাম এই অ্যাসাইনমেন্টে।'

রানার মুখের চেহারা দেখে বুঝল মুজাদ্দিদ ওর মনের অবস্থাটা। নিঃসঙ্কোচে রানার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করল সে। হঠাৎ খেয়াল করল শীতে

কাঁপছে রানা। তাড়াতাড়ি নিজের কম্বলটা এনে চাপিয়ে দিল সে রানার গায়ের ওপর। তারপর বলল, 'বুঝলাম। এখন আমি কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে? বলাই বাহুল্য, আপনার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েছি আমি আগেই।'

'ধন্যবাদ। এখন কিছুই করতে হবে না, শুধু এই যন্ত্র আর একটা চিঠি দেব আমি, এগুলো কাল ভোরে পুলিস কমিশনারের কাছে পৌছে দিতে হবে গোপনে।' গেইজার কাউন্টার আর মিটার রাখল রানা টেবিলের উপর।

অল্পকথায় গুছিয়ে লেনিন M-315-এর ব্যাপারটা লিখল রানা কমিশনারকে বুঝিয়ে। সেই সাথে ম্যাখারভ ও আবু তাহেরের পরিণামটাও লিখল। ইয়টের কথা বিস্তারিত বলবার দরকার হলো না, রানা জানে এই ইয়টের ওপর বহুদিন থেকেই নজর আছে পুলিস কমিশনারের।

চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল মুজাদ্দিদ রানার দিকে। রানা বলল ওকে সব ব্যাপার। সব শুনে মহা চিন্তায় পড়ে গেল মুজাদ্দিদ। রানাকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখে শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'এত ঘটনার পরেও আপনি আবার ফিরে যাচ্ছেন ওই ঘরে? ওরা আপনাকেও যে খুন করবে না তার কোনও নিশ্চয়তা আছে?'

'তা নেই। ওরা আমার সম্পর্কে কতখানি জানে, আবু তাহেরকে হত্যা করে আমার কামরাটাও ওরা খোঁজ করেছিল কিনা, গোপনে এ বাড়ি ছেড়ে আমার বাইরে যাবার খবর ওরা জানে কিনা—কিছুই জানা নেই আমার।'

'তবে?'

'ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হচ্ছে। ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

'ইয়াকুব বে-কে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করুন না।'

'ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। তাছাড়া মিনিস্ট্রি লেভেলে তো আছেই, পুলিস বিভাগেও লোক আছে ওর—আগে থেকে টের পেয়ে গিয়ে আরও সাবধান হয়ে যাবে ও। তাছাড়া, ওর উদ্দেশ্য এখনও বের করা যায়নি। উদ্দেশ্যই না বের করতে পারলে বাধা দেব কোনখানটায়? কাজেই ফিরে যেতে হবে আমার ওই কুঠুরিতে। এমনও হতে পারে আমি ওদের সন্দেহের বাইরে আছি। হয়তো বাইরে থেকে বল্টু লাগানো দেখে ওরা আমার ঘরে যায়নি। মিছিমিছি খুনের সাক্ষী বাড়াতে চাইবে না ওরা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়েছে—এখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না।'

'কিন্তু সেই কাঠখড়েই তো পুড়ে মরল আবু তাহের।' মুজাদ্দিদের

চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'দেখুন, বিপদ আর ঝুঁকি নিয়েই আমাদের কারবার। আপনি চিন্তিত হবেন না মিছিমিছি। কাল্পনিক বিপদটা সত্যিকার বিপদের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর। আচ্ছা, উঠি এখন। কাল খুব ভোরে যেভাবে বললাম সেইভাবে এই যন্ত্র আর চিঠিটা পৌঁছে দেবেন, কেমন?'

'আচ্ছা। আপনি যখন নিষেধ শুনবেন না, যাবেনই যখন বিপদের মুখে, তখন আমার পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে যান। আপনাকে তো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র দেখলাম।'

'ধন্যবাদ। পিস্তল লুকোবার জায়গা নেই আমার দেহে। ওটা নিলেই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আমি নই। একটা ছুরি আছে আমার কাছে লুকোনো—আর সেটা ব্যবহারের কৌশলও জানা আছে আমার। চলি এখন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে। নিঃশব্দেই ঢুকল গিয়ে নিজের কামরায়।

আট

রাত আড়াইটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় পদ্মাসনে বসে আছে রানা আবু তাহেরের বিছানার ওপর। জামা-কাপড়, জুতো-মোজা সব শুকাচ্ছে ইলেকট্রিক স্টোভে। নিজের এই দিগম্বর দশা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয় রানা। গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করছে সে—চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাধান করবার চেষ্টা করছে সে কয়েকটি জটিল সমস্যার।

আবার একবার অন্ধকারেই সমস্ত ঘরটা ঘুরে এল রানার দৃষ্টি। বিছানা দেখে বোঝা যাচ্ছে শুয়েছিল আবু তাহের এই বিছানায়। বোধহয় ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু সামান্যতম শব্দেও তো ওর জেগে যাবার কথা। ওর জাগ্রত অবস্থায় সামনাসামনি ওকে আক্রমণ করবার সাহস দুর্দান্ত ইয়াকুব বে-রও হবে না—ওর চেলা-চামুণ্ডা তো দূরের কথা। তাছাড়া ও জেগে আছে না ঘুমিয়ে, সেকথা বাইরে থেকে ওদের টের পাওয়ার কথা নয়। তাহলে? একমাত্র উত্তর, ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল ওকে। কিভাবে?

চট করে চোখ পড়ল রানার তুরস্কের ঘরে ঘরে টেবিলের ওপর যে বোতলটা থাকে তার ওপর। নেমে এল সে আবু তাহেরের বিছানা থেকে

পেন্সিল টর্চ হাতে। ঠিক। রাকির বোতলের তলায় পাতলা এক পরতা সাদা পাউডারের আস্তরণ। গ্লাসটাও পরীক্ষা করল রানা। সেটার তলায়ও আছে। তাহলে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল ওরা আবু তাহেরকে যাতে দরজা খুলবার সময় টের পেয়ে কোনও রকম বাধা দিতে না পারে। তবু বোধহয় টের পেয়েছিল আবু তাহের। উঠে বসেছিল বিছানার ওপর। হয়তো মনে করেছিল, রানা ফিরে এসেছে কাজ সেরে। ওর মৃতদেহ দেখেই বোঝা যায় জাগ্রত অবস্থায় খুন করা হয়েছে ওকে। রানার বদলে পিস্তল হাতে কোহেনকে প্রবেশ করতে দেখেই বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠেছিল আবু তাহের। কিন্তু সময় ছিল না আর। পিস্তল বের করবার আগেই গুলি করেছে কোহেন। সেই আতঙ্কিত দৃষ্টিটাই স্থায়ী হয়ে গেছে ওর অবশিষ্ট চোখে।

আবু তাহেরকে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত তাহলে ওরা আজ বিকেলেই নিয়েছে। কারণ ডিনার খাবার পরেই বোতলটা দিয়ে গেছে ওদের একজন, প্রায়-ভরা আরেকটা বোতল থাকা সত্ত্বেও।

কিন্তু কেন? কেন হত্যা করা হলো ওকে? কি ভুল হয়েছিল আবু তাহেরের? রানা বুঝল, এই প্রশ্নের উত্তর বের করবার মত কোনও সূত্র আপাতত নেই ওর হাতে। উত্তর সে বের করবেই, কিন্তু সময় লাগবে।

জামা-কাপড় উল্টে দিয়ে আবার এসে বসল রানা বিছানার ওপর। গত দেড় মাসের ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

রানার সেদিন ঢাকার বাইরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কেন জানি কিছু ভাল লাগছিল না ওর। গত তিনমাস হাতে কোনও কাজ না থাকায় খাঁচায় বন্দী বাঘের মত ছট্‌ফট্ করছিল সে। একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। সোজা চলে গেল সে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আখড়ায়। মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার সাততলা সেই বাড়িটার ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা ছাড়াও মাটির নিচের আরেকটা তলা আছে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অধীনে। সেটা ইন্টেলিজেন্স অপারেটারদের ব্যায়াম কক্ষ। এজেন্টদের শারীরিক পারদর্শিতার দিকে তীক্ষ্ণ নজর আছে মেজর-জেনারেল রাহাত খানের। ইতোমধ্যেই কয়েকবার জাপান থেকে জুজুৎসু ও কারাতের এক্সপার্ট এনে অপারেটারদের বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত ব্যায়াম, কুস্তি, বক্সিং আর পিস্তল ছোঁড়ার প্র্যাকটিসের সর্ববিধ সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি এজেন্টদের।

গোটা কতক বৈঠক আর বুক ডন দিয়ে উঠে সিলিং থেকে ঝুলানো একটা বালির বস্তাকে বেধড়ক পিটিয়ে কিছুটা চাঙ্গা বোধ করল রানা। তোয়ালে

দিয়ে ঘর্মাক্ত দেহটা মুছে নিয়ে হংকং থেকে মায়া ওয়াং-এর পাঠানো হাওয়াই শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এল সে আখড়া থেকে। সোজা চলে গেল ছ'তলার ওপর নিজের অফিস কামরায়।

নিজের চেয়ারে বসে সবে একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুলেছে, এমনি সময় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন স্বয়ং মেজর জেনারেল রাহাত খান। এই ঘটনা রানার কল্পনারও বাইরে। কোনও প্রয়োজন হলে ইন্টারকমে ডাক আসবে সাততলায় ওঁর অফিস কামরায় দেখা করবার জন্যে, কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হবে সে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখের সামনে—সেটাই স্বাভাবিক। উনি নিজে নেমে আসবেন রানার কামরায়, সেটা একটা অচিন্তনীয় অকল্পনীয় ব্যাপার। আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটেনি কখনও।

কয়েক সেকেন্ড বিস্ফারিত চোখে বোকার মত চেয়ে থেকে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার ছেড়ে। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে হেলে দুলে রানার ঘরে ঢুকছিল চালিয়াত জাহেদ ইকবাল—রানা ও তার সামনে স্বয়ং রাহাত খানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। দুই সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাহাত খান কিছু বোঝার আগেই গুলি খাওয়া বাঘের মত তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল সে দরজার ওপর থেকে।

এতসব ঘটনা কিচ্ছু চোখে পড়ল না বৃদ্ধের। কাঁচা-পাকা ভ্রূ জোড়া কুঁচকে কি যেন ভাবছেন তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে। এগিয়ে এলেন তিনি রানার টেবিলের কাছে। পা বাধিয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে বসলেন তাতে। রানাকে ইঙ্গিত করলেন বসবার জন্যে মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে। এইসব ইঙ্গিত রানার মুখস্থ। চাবি দেয়া পুতুলের মত টুপ করে বসে পড়ল রানা নিজের চেয়ারে। বুঝল, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কিছু ঢুকেছে বুড়োর মাথায়। নইলে এমন বেদিশা হয়ে পড়বে কেন?

'ইস্তাম্বুল থেকে একটা জরুরী তার এসেছে, রানা। আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে তোমাকে যেতে হবে ইস্তাম্বুল। আরসিডি-র শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের ব্যাপার। যেমন সিরিয়াস, তেমনি ইন্টারেস্টিং। তুমি পারবে যেতে? অসুবিধা নেই তো কোনও?'

'না, স্যার।' অসুবিধা মানে? ব্যাপারটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছে রানার বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত। এই তো সে চায়। ভয়ঙ্কর কোনও অ্যাসাইনমেন্ট না হলে এতখানি বিচলিত হত না বুড়ো মিঞা। ছুটে চলে আসত না অফিশিয়াল রীতিনীতি ভুলে সামান্য একজন অপারেটারের কামরায়।

রানার ভেতরে যে আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল সেটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করলেন রাহাত খান। হয়তো একশো ছাপ্পান্নতম বার মনে মনে ভাবলেন—ছোঁড়া একেবারে আমার মত। ওর বয়সে আমিও ঠিক ওরই মত ছিলাম। পাগল একটা। কোনও একটা কঠিন কাজের কথা বললেই ধনুকের ছিলার মত টান হয়ে যায়।

নিজের মনের ভাবটা গোপন করতে পারেন না বৃদ্ধ। সস্নেহ একটা মধুর হাসি ফুটে উঠল ওঁর ঠোঁটের কোণে। রানাও একশো ছাপ্পান্নতম বার উপলব্ধি করল ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা তো করেই—কত গভীরভাবে ভালবাসে সে এই কঠিনে কোমলে মেশানো তীক্ষ্ণধী বৃদ্ধকে। এঁর একটি আঙুলের ইঙ্গিতে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে দ্বিধা করেনি কোনদিন, করবেও না।

হঠাৎ সচকিত হয়ে লক্ষ করলেন বৃদ্ধ রানা চেয়ে আছে ওঁর দিকে। মুহূর্তে গম্ভীর ভাব ধারণ করলেন তিনি। যেন দুর্বলতা কাকে বলে তিনি জানেন না।

'বেশ। তাহলে দুটোর পর একবার আমার কামরায় এসো।'

'জ্বি, স্যার।'

'তুমি এখুনি বাসায় ফিরে সব ব্যবস্থা করে ফেলো। অন্তত পনেরো বিশ দিন বাইরে থাকতে হবে তোমাকে।'

'জ্বি, স্যার।'

উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। রানাও উঠল সাথে সাথে চাবি দেয়া পুতুলের মত। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে তিনি কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'মাফিয়া!' তাতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। মাথা ঝাঁকাল সে। বেরিয়ে গেলেন রাহাত খান ঘর থেকে।

আরে! এসব কথা ভাবছে কেন সে? পোড়া-পোড়া একটা গন্ধ নাকে যেতেই বাস্তবে ফিরে এল রানা। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে জামা কাপড়গুলো আবার উল্টে দিয়ে এল সে। বিছানায় উঠতে যাবে এমন সময় মৃদু টোকা পড়ল দরজায়।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আবার মৃদু টোকা। কে হতে পারে? যোরা, না মুজাদ্দিদ? এত আস্তে টোকা দিচ্ছে যখন, তখন নিশ্চয়ই কেউ গোপনে দেখা করতে চায় রানা বা আবু তাহেরের সঙ্গে। কিন্তু কে হতে পারে?

নিঃশব্দে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কান লাগাল দরজার গায়ে। আবার টোকা পড়ল দরজায়। আবু তাহেরের কণ্ঠস্বর নকল করে আস্তে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কে!'

'আমি যোরা!' প্রায় অস্ফুট একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে।

'দরজাটা খুলুন জল্দি!'

আস্তে করে বল্টুটা নামিয়ে এক ঝট্কায় দরজা খুলেই টেনে আনল যোরাকে রানা ঘরের ভিতর। কিন্তু করিডরের মৃদু আলোয় দেখে ফেলেছে সে রানাকে। একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে আসছিল ওর মুখ থেকে, চেপে ধরল রানা ওর মুখ। ধস্তাধস্তি করে ছুটবার চেষ্টা করল সে কিছুক্ষণ, কিন্তু লোহার মত শক্ত রানার একটা হাত জড়িয়ে ধরে আছে ওকে—ছুটতে পারল না। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল রানা, 'চুপ! টুঁ শব্দ করলে খুন করে ফেলব!' মুখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। বল্টু তুলে দিল ওপরে। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যোরার, চিৎকার করা তো দূরে থাক কথাই বলতে পারছে না সে আর। ধস্তাধস্তি করবার সময়ই পরিষ্কার টের পেয়েছে সে, সম্পূর্ণ নগ্ন রানার দেহ। অবাক চোখে চাইল সে স্টোভের দিকে। রানার সমস্ত জামা-কাপড় শুকোচ্ছে সেখানে। এমন ভাবে ভিজল কি করে রানা বুঝে উঠতে পারল না সে কিছুতেই।

এবার একটা হাত ধরে টেনে এনে বিছানার উপর বসাল রানা যোরাকে। হঠাৎ ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের ছায়া দেখে লজ্জা পেয়ে গেল সে। আবু তাহেরের কম্বলটা টান দিয়ে নিয়ে লজ্জা নিবারণ করল। তারপর যোরার পাশে বসে পড়ে বলল, 'কেন এসেছ এত রাতে?'

'আবু তাহের কোথায়?'

'আমার প্রশ্নের আগে জবাব দাও।'

'ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'সাবধান করতে এসেছ ওকে?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'ওকে খুন করবার আদেশ দিয়েছে ইয়াকুব বে, তুমি আড়ি পেতে শুনেছ সে আদেশ, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'ওকে কেন খুন করতে চায় ইয়াকুব?' উত্তেজিত ভাবে চেপে ধরল রানা যোরার দুই বাহু।

'ওরা জেনে ফেলেছে, আবু তাহের নাকি টার্কিশ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক।' ভয়ে ভয়ে বলল যোরা।

'কি করে জানল?'

'কাল দুপুরে ও যখন বেরিয়ে যায় এ বাড়ি থেকে তখন ওর পেছনে এদের লোক লেগে ছিল। একজনকে নাকি ভাঁওতা দিয়ে খসিয়ে পোস্ট অফিসে ঢুকে

পড়েছিল সে। কিন্তু আরও যে লোক ওর ওপর নজর রেখেছে তা টের পায়নি। আঙ্কারার হেড অফিসে নাকি একটা কোডেড মেসেজ পাঠিয়েছে আবু তাহের—ওর পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে এদের লোক সেই মেসেজটা। মেসেজের কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু ঠিকানার তো আর কোড হয় না, পরিষ্কার দেখেছে সে ঠিকানাটা। খবর দিয়েছে ইয়াকুবকে। কিন্তু কোথায় গেল আবু তাহের?' ঘরের চারদিকে খুঁজল যোরার দৃষ্টি।

'অনেক দেরি করে ফেলেছ, সুন্দরী। ওকে খুন করে কবর পর্যন্ত দেয়া হয়ে গেছে। ওই বাগানে ডালিয়া বেডের পাশের খালি বেডের নিচে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।'

চমকে উঠল যোরা। বলল, 'তুমি জানলে কি করে?'

'তবে শোনো...'

আগাগোড়া বুঝিয়ে বলল রানা যোরাকে। স্তম্ভিত হয়ে গেল যোরা সব শুনে। বিশ্রী একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িয়ে পড়েছে সে ও তার বাবা; এটুকু সে আগেই বুঝতে পেরেছিল—কিন্তু সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কতখানি ভয়ঙ্কর, ইয়াকুব বে যে কতখানি শক্তিশালী একটা প্রতিষ্ঠানের নেতা, বুঝতে পেরে পাংশু হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। ও মনে করেছিল সাময়িক এই দুরবস্থা কেটে যাবে অল্পদিনেই, অল্পদিনেই ইয়াকুব বে-র দূষিত প্রভাব কাটিয়ে উঠে আবার স্বতঃস্ফূর্ত খুশির ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করে উঠবে ওদের ছোট্ট পরিবারটা। কিন্তু এখন উপলব্ধি করল, সহজে মুক্তি নেই ওদের—ইয়াকুব বে-র কোনও একটা মহাপরিকল্পনার চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন ওর কোটিপতি পিতা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর ওদের ভাগ্যে কি ঘটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

'কিন্তু তোমাদের আগ্রহ কি কেবল জাহাজটাতেই সীমাবদ্ধ, না আরও কিছু?'

'জাহাজটা তো বটেই, পুরো শিপ বিল্ডিং করপোরেশনের এক তৃতীয়াংশের মালিক পাকিস্তান। সেই হিসেবে সামগ্রিক ভাবে এই করপোরেশন ও তার যোগ্য পরিচালককে এই হীন দস্যুদলের প্রভাবমুক্ত করাটাও আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের যদ্দূর বিশ্বাস তোমার বাবা স্বেচ্ছায় এদের সহযোগিতা করছেন না। যদি তাই হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হবে না। কিন্তু সবকিছুই এখন নির্ভর করছে ইয়াকুব বে-র ওপর। আশ্চর্য গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করছে সে। কি যে সে করতে যাচ্ছে সেটাই বোঝা যায়নি এখন পর্যন্ত। কেন সে তোমার বাবার ওপর প্রভাব খাটিয়ে আগামী মার্চ মাসে যে জাহাজের কাজ শেষ হবার কথা সেটাকে

ডিসেম্বরেই সম্পূর্ণ করিয়েছে, যাত্রী হিসেবে নিজে এবং জনা কয়েক সাঙ্গপাঙ্গের টিকেট কেটেছে, বোঝা যাচ্ছে না। ঘটতে চলেছে কিছু। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটবার কিছুক্ষণ আগেও যদি বোঝা যায় তাহলেও হয়তো কোনও প্রতিকার করা সম্ভব হতে পারে—সেই আশায় আমি নিজেকে জড়িয়েছি এর মধ্যে।'

'তোমার সম্বন্ধে আব্বার সেই খারাপ ধারণাটাই রয়ে গেছে। হয়তো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমার জরুরী কোনও কাজে বাধা দিয়ে বসতে পারেন। বলব আমি ওঁকে সবকিছু?'

'না। এখনও সময় হয়নি। সময় হলে আমি নিজেই বলব। যে-কথা শুনলে আজ, ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না কারও কাছে। কিন্তু আজ সকালে যদি আমার ওপর কোনও রকম হামলা হয় তাহলে যে করে হোক খবরটা জানাবে পুলিস কমিশনারকে।'

কাপড়গুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, পরে নিল রানা। বন্ধ করে দিল ইলেকট্রিক স্টোভ। তারপর যোরাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে। নিজের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। দুটো চাবি এগিয়ে দিল যোরার দিকে।

'একটা হলো এই হ্যান্ডকাফের চাবি, আরেকটা বাইরের দরজার। দুই হাত খাটের এই রডের দু'পাশ দিয়ে দিচ্ছি, তুমি হ্যান্ডকাফটা হাতে পরিয়ে চাবি লাগিয়ে দাও। এই ঘর থেকে বেরিয়ে বল্টু লাগিয়ে দেবে, আর এটা দিয়ে আবু তাহেরের ঘর দিয়ে করিডরে বেরোবার দরজাতেও চাবি লাগিয়ে দেবে। তারপর চাবি দুটো আলাদা আলাদা ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওই টেনিস লনের দিকে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল যোরা। হাসল। তারপর বলল, 'দুঃসাহসী যুবক, খুব সম্ভব তুরস্কের একটি রমণীর হৃদয় নিয়ে ফিরতে হবে তোমাকে এবার দেশে।'

হ্যান্ডকাফের চাবি লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল যোরা ঘর থেকে। বল্টু তুলে দিল বাইরে থেকে কুঠুরির দরজার। তারপর অত্যন্ত ক্ষীণ একটা শব্দ এল রানার কানে—বোধহয় কান পেতেছিল বলেই—আবু তাহেরের কামরা দিয়ে করিডরে বেরোবার দরজার চাবি লাগানোর।

ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত রানা।

নয়

চমৎকার মেক আপ্ হয়েছে রানার। পাকানো এক জোড়া গোঁফ, ডান গালের ওপর মস্ত একটা কালো আঁচিল—কোঁকড়া একটা চুল বেরিয়ে আছে আবার তার মধ্যে থেকে। সিঁথিহীন ব্যাক ব্রাশ করা চুলের মাঝ বরাবর লম্বা একটা সিঁথি কেটে দু'পাশে টেনে দেয়া হয়েছে চুল, জুলফির কাছে কাঁচা-পাকা করে দেয়া হয়েছে, গালের ওপর কয়েকটা আঁচড় কেটে বিশ বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওর বয়সটা, চোখ দুটো ঢুকে গেছে গর্তে—চোখের কোলে কালি, বাই-ফোকাল লেন্সের চশমা। সবটা মিলে এক কথায় চমৎকার। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে হেসে ফেলল রানা। কিন্তু সেই সাথে মাফিয়ার প্রতিটা কাজে কি পরিমাণ যত্ন ও পারদর্শিতা থাকে সেটা বুঝতে পেরে বিস্মিতও হলো কম না। ফিরে গেল সে কনফারেন্স রূমে। হাতে হাতকড়াও নেই, আশে-পাশে বডিগার্ডও নেই।

সকাল সাড়ে-আটটায় ঘুম থেকে তোলা হয়েছে ওকে। হাত-বাঁধা অবস্থায় অকাতরে ঘুমাচ্ছে দেখে ওকে সন্দেহ করবার কথা মনেও আসেনি ওদের। আজ কেন জানি খারাপ ব্যবহার করল না প্রহরীরা—হয়তো ইয়াকুবের নিষেধ আছে। রানা বুঝল, হয় বিপদ কেটে গেছে, নয়তো প্রচণ্ড আঘাতের আগে ওর মধ্যে মিথ্যে নিরাপত্তা বোধ জন্মিয়ে অপ্রস্তুত করে নেয়া হচ্ছে।

চায়ের টেবিলে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা করল ওকে ইয়াকুব বে। কোহেনের গম্ভীর মুখে ভাব পরিবর্তন হলো না কোনও।

'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল আমার, কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলে সময় করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া এই টেলিগ্রামটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আপনার ব্যাপারে আমরা আমাদের ঢাকা ব্রাঞ্চে তার করেছিলাম, ওরা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জোগাড় করেছে আপনার সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য। এবং জজের রিপোর্টের সঙ্গে সেটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই টেলিগ্রামটা না পেলে আপনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না আমি। ভাবছিলাম, এমনও হতে পারে সবটা ব্যাপারই পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেই বুদ্ধিমান বুড়োর একটা চাল। অল্পক্ষণ আগেই এসেছে টেলিগ্রামটা—আস্থা এসেছে আমাদের,

আপনার প্রতি যেটুকু দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সেটুকুর জন্যে আমি দুঃখিত। অবশ্য একটু পরেই বুঝতে পারবেন সেটুকু দুর্ব্যবহারের বদলে আপনি যা লাভ করতে যাচ্ছেন তার মূল্য আপনার কাছে অপরিসীম।'

'কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না,' ভেতরের পুলক চেপে রেখে নিরুৎসুক কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল রানা।

'বুঝতে পারবেন। তার আগে আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। ডায়মন্ড কাটিং শিখেছেন আপনি কোথা থেকে?'

'বার্মিজ একজন এক্সপার্ট উ সেনের কাছ থেকে। ও শিখেছিল অ্যান্টওয়ার্প থেকে।'

'কি কাট?'

'রিজেন্সী-ব্রিলিয়ান্ট দু'রকমই।'

'আপনার কাটা ইমিটেশন ডায়মন্ডকে আসল বলে চালানো যাবে?'

'নিশ্চয়ই। যাবে কি বলছেন, অন্তত পঁচিশটা পাথর চালিয়েছি আমি।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইয়াকুব বে-র মুখ। সেই ভাবটা গোপন করবার জন্যে মুখটা নিচু করে একটা সিগারেট ধরাল সে।

'ঠিক আছে। এখন মন দিয়ে শুনুন। আজ আমাদের সাথে জাহাজে চাপতে হবে আপনাকে। পাকিস্তানী জাহাজ, কিন্তু ভয় পাবেন না, চিনতে পারবে না কেউ। ছদ্মবেশে নিয়ে যাব আপনাকে। আপনার পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে, এই দেখুন আপনার ছবি, চিনতে পারছেন?' পাসপোর্টে সাঁটা অপরিচিত একজন লোকের ছবি দেখাল ইয়াকুব বে। 'এই চেহারায় আপনি যাচ্ছেন আজ আমাদের সঙ্গে। ডায়মন্ড সম্পর্কিত কিছু কাজ করতে হবে আপনাকে আমাদের জন্যে। বদলে আমরা প্রচুর পুরস্কার দেয়ার পর নিরাপদে পৌঁছে দেব আপনাকে পৃথিবীর যে কোনও জায়গায়। ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে যোগও দিতে পারেন আপনি। আপনি যেমন বলবেন তেমনি হবে।'

'যদি আমি এ প্রস্তাবে রাজি না হই?'

'তাহলে টার্কি পুলিসের হাতে তুলে দেব আমরা আপনাকে। তার মানে অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু রাজি না হওয়ার তো কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'রাজি আছি আমি। চাঁদের এপিঠ-ওপিঠ দু'পিঠই দেখে নিলাম আর কি। এপিঠই আমার পছন্দ। কিন্তু জাহাজে করে কোথায় যাচ্ছি?'

'সেটা যথাসময়ে জানতে পারবেন।'

'ভাল কথা, আবু তাহেরের কি হলো? ওকে দেখছি না যে?'

'ওকে চেক দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি।' একটু গম্ভীর হয়ে গেল ইয়াকুবের মুখটা আবু তাহেরের কথায়। দু'বার তালি দিতেই ঘরে ঢুকল একজন বেঁটে লোক। ওর দিকে ইঙ্গিত করে রানাকে বলল, 'ওর সঙ্গে যান, পনেরো মিনিটেই ভোল পাল্টে দেবে আপনার।'

রানা উঠে চলে গেল বেঁটে লোকটার সাথে। লক্ষ করল, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মুখটা ওপর দিকে তুলে চোখ বন্ধ করে রেখেছে কোহেন। ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরা। পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়া উঠছে উপরে।

সত্যিই চিনতে পারল না রানাকে জাহাজের কেউ। যোরাও না।

সমস্ত জাহাজ ঘুরে ফিরে দেখল রানা। টের পেল সে, কয়েক জোড়া চোখ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ওর ওপর—কিন্তু বুঝেও না-বোঝার ভান করল সে।

তেরো হাজার টনের জাহাজ। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর তৈরি দশ হাজার হর্স পাওয়ারের শক্তিশালী ডিজেল টারবাইন এঞ্জিন। টপ স্পীড টোয়েনটি নট্। লম্বা—৬০১ ফুট, চওড়া—৮০ ফুট। মাঝারি সাইজ। মাল ও যাত্রী বহনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। সদ্য পেইন্ট করবার ফলে তার্পিনের তীব্র গন্ধ। প্রচুর মাল-পত্র ছাড়াও ষাট-পঁয়ষট্টিজন যাত্রী উঠেছে। পাকিস্তান নেভির অফিশিয়ালরা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে, জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে খালাসী পর্যন্ত নিজেদের লোক। আনুষ্ঠানিকভাবে করাচিতে জাহাজটা কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে জাহাজের প্রথম প্যাসেঞ্জার হিসেবে উঠেছেন কন্যাসহ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসান খলীল। চারপাশে স্বদেশী একটা পরিবেশ পেয়ে অদ্ভুত একটা নিরাপত্তাবোধ জাগল রানার মনে।

জাহাজের ফার্স্ট অফিসার এহসান শেষ কয়েকটা মাল দ্রুত জাহাজে তোলার জন্যে নিজে তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। রানার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই ভদ্রলোকের— কণ্ঠস্বর চিনবারও ভয় নেই। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, ঠিক ক'টার সময় ছাড়বে জাহাজ?'

এই গায়ে পড়া আলাপ বোধহয় পছন্দ হলো না ফার্স্ট অফিসারের। পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'ক'টায় ছাড়বার কথা ছিল?'

'দুটোর সময়।'

'তাহলে দুটোর সময়ই ছাড়বে।'

'ধন্যবাদ।'

চলে এল রানা। সেই চারটে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সের তৃতীয় বাক্সটা তোলা হচ্ছে তখন। গত রাতে খালি দেখেছিল সে এগুলো। ভেতরে সত্যি সত্যিই

কিছু আছে কিনা দেখবার অদম্য কৌতূহল হলো রানার—কিন্তু চেপে গেল। সুযোগ মত অন্য সময় দেখা যাবে।

হঠাৎ কিছুদূরে ক্যাপ্টেন আনসারীর সঙ্গে কমোডোর জুলফিকারকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ কমোডোর জুলফিকারও তাহলে এসে হাজির হয়ে গেছেন! ওরাও কিছু টের পেয়েছে নাকি? ইয়াকুবের প্ল্যানটা কি জাহাজ সংক্রান্ত?

কাছে গিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধবার ছলে দাঁড়াল রানা। শুনল কমোডোর জুলফিকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন, 'এটা আমি মোটেই সমর্থন করতে পারছি না, আনসারী। না না, সোজা মানা করে দাও। লোক তুলতে পারি—বিশেষ করে একজন নেমে যাওয়ায় একটা কেবিন খালি আছে সেখানে আরেকজনকে নেয়া যায়। কিন্তু লাশ নেয়া ঠিক হবে না। অশুভ। জাহাজে কফিন তুলে যাত্রা শুরু করা কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কিন্তু এভাবে রিফিউজ তো করতে পারি না আমরা, স্যার। গ্রীক এমব্যাসির লোক, সাম্প্রতিক দাঙ্গায় মারা গেছে। অ্যামব্যাসাডারের অনুরোধ-পত্র আছে। অথরাইজেশন, শিপিং নোট সব রেডি। এথেন্সে যখন যাচ্ছেই জাহাজ...'

'ক্রু-দের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবেছ? দুই দুইটা কফিন। চার দিনের মড়া।'

'ক্রু-দের না জানালেই চলবে। কফিনগুলো সীসা দিয়ে আটকানো—গন্ধ ছুটবে না। জাহাজের খোলের ভেতর রেখে দেয়া যাবে এক কোণে। টিকেট কেটে জাহাজে উঠে পড়েছে সেই গ্রীক ভদ্রলোক—পাপাগোস। লাশ দুটোর একটা আবার তার আত্মীয়। এখন নিষেধ করি কি করে?'

'যা ভাল বোঝ করো। আমার এতে সমর্থন নেই। ব্যাটারা অ্যাক্সিডেন্ট করবারও সময় পেল না!' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়ল কমোডোরের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে দেখে কটমট করে চাইলেন তিনি একবার রানার দিকে। চিনতে পারলেন না। চলে গেলেন ক্যাপ্টেন আনসারীর সঙ্গে বকর-বকর করতে করতে।

রানা বুঝল, পোর্ট সাঈদে নামবে বলে যে প্যাসেঞ্জারটা সস্ত্রীক উঠেছিল তেরো নম্বর কেবিনে, তারা কায়রো থেকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে নেমে গেছে। তাদের তিন ছেলেই নাকি একটা মারাত্মক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে গুরুতর জখম হয়েছে। প্লেনে চলে যাচ্ছে ওরা আজ কায়রোতে। সেই খালি জায়গায় কোনও গ্রীক ভদ্রলোক উঠেছেন, এবং ওঠার পর গোটা দুই কফিন

নিতে চাচ্ছেন সাথে করে। তাই কমোডোর খেপে গেছেন। হেসে এগোল সে সামনে।

চার নম্বর হোল্ডের স্টারবোর্ড সাইডের কাছে এসেই চোখ পড়ল রানার গ্যাঙওয়ের ওপর। বৃদ্ধ ডাক্তার উঠে আসছেন জাহাজে। আশপাশে মুজাদ্দিদকে খুঁজল রানার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। কোথাও দেখা গেল না তাকে। আসেনি সে। সব খবর শুনে পুলিস কমিশনারের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, ইয়ট সার্চ করে লেনিন M-315 উদ্ধার করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি খবর জানবার জন্যে আকুলিবিকুলি করে উঠল রানার ভিতরটা। খবরটা কি ডাকু চাচার কাছে পাওয়া যাবে? যদি যায়ও এই মুহূর্তে জানবার কোন উপায় নেই রানার। রানাকে চিনতে তো পারবেনই না, কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে উঠবেন ওর গোঁফ দেখে। গোঁফ ডাক্তার দুই চোখে দেখতে পারেন না। গতকালই বেলা এগারোটার দিকে উচ্চকণ্ঠে তর্ক করতে শুনেছে রানা ডাক্তারকে হাসান খলীলের সঙ্গে।

'অসম্ভব!' বলছিলেন ডাক্তার, 'আমাকে কেটে ফেললেও বিশ্বাস করব না আমি একথা। ওই গোঁপওয়ালা লোকটাই মাসুদ রানা। ও-ই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল যোরাকে কোর্ট থেকে।'

'তোমার মাথায় কিছু একটা ঢুকলে কোনমতেই আর বেরুতে চায় না, ডাক্তার। যোরা পর্যন্ত বলছে...' আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন হাসান খলীল, খেপে উঠল ডাকু চাচা।

'যোরা? যোরা কি জানে? ও তো সেদিনের বাচ্চা, ওর কথায় তুমি এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন আমি তো বুঝতে পারছি না। জানো, আমি দু'দুটো গোঁপওয়ালা লোক দেখেছি। দুটোই পাজি।'

এই অকাট্য যুক্তিকে খণ্ডন করা যায় না। মৃদু হেসে চলে গেছেন হাসান খলীল বাড়ির ভেতর। ডাক্তার গিয়ে ঢুকেছেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে। রানা সরে এসেছে জানালার ধার থেকে।

এগিয়ে গেল রানা গ্যাঙওয়ের দিকে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। যদি মুজাদ্দিদ ওঁকে সব কিছু বলে থাকে তাহলে খবরটা দেয়ার জন্যে নিজেই খুঁজে নেবেন তিনি রানাকে। হাজার হোক, যেমন জ্ঞানী তেমনি প্রতিভাবান লোক। একবার যদি ঠিক ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢোকানো যায় তাহলে অত্যন্ত কাজে আসবে ভেবেই ডাক্তারকে সব কথা জানাবার অনুমতি দিয়েছিল রানা মুজাদ্দিদকে।

যোরা ছুটে এসে ধরেছে ডাকু চাচার হাত।

'তুমি আবার এলে যে? তোমার না ইস্তাম্বুলেই থাকবার কথা? গুরুর অভাবে তোমার ভক্ত শিষ্য জ্ঞান-তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা পড়বে না?'

মুজাদ্দিদ যে ডাকু চাচার অন্তরে ওর পাশাপাশি একটা স্নেহের আসন জবর দখল করে নেবে এটা যোরার সহ্য হয় না। বরাবর বিষ নজরে দেখে সে মুজাদ্দিদকে। ওর এই হিংসা ভেতর ভেতর উপভোগ করেন ডাকু চাচা। মৃদু হাসলেন তিনি। কুলিকে পঞ্চাশ কুরুস বকশিশ দিলেন।

'এদের মেডিক্যাল অফিসার হঠাৎ মেডিক্যাল লিভ নিয়ে বসেছে। অথচ মেডিক্যাল অফিসার ছাড়া জাহাজ ছাড়েই বা কি করে? অগতির গতি এই ডাকু চাচা। নেহাত হাসান ধরল বলেই যাচ্ছি। নইলে...' রানার দিকে চোখ পড়ল ডাক্তারের। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দৃষ্টিটা এক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর অবাক হয়ে দেখল রানা, মৃদু হেসে একটা চোখ টিপলেন তিনি। যেন হঠাৎ কোনও জরুরী কথা মনে পড়ে গেল এমনি কণ্ঠে তিনি যোরাকে বললেন, 'ওহ্-হো, ভালকথা। তোর ক্যামেরাটা নিয়ে মুজাদ্দিদ আজ সকালে গিয়েছিল একটা ইয়টের ছবি তুলতে। একটা ছবিও তুলতে পারেনি। ফিল্ম ছিল না।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল রানার। পাওয়া যায়নি লেনিন M-315—রাতারাতি সরিয়ে ফেলেছে ওরা বোমাটা। আশ্চর্য!

'ক্যামেরা?' অবাক হয়েছে যোরাও, কিন্তু ডাকু চাচা ওর হাতে মৃদু চাপ দিতেই চেপে গেল সে। বলল, 'ও, ফিল্ম ছিল না বুঝি?'

'না। খুব ঠকা ঠকেছে বেচারা। চল্, এগোই। আমার ডিপার্টমেন্টটা আবার বুঝে নিতে হবে।'

চলে গেল ওরা। রেলিঙের ধারে চলে এল রানা। নীল সমুদ্রে সুদূরের হাতছানি। রেলিং-এ ভর দিয়ে চেয়ে রইল রানা মিনার আর গম্বুজের দেশ ইস্তাম্বুলের দিকে। মাথার মধ্যে ঘুরছে ওর ডাকু চাচার কথাগুলো। ঠিকই বুঝেছিল রানা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এই ডাকু চাচা।

ঠিক দুটোর সময় ছাড়ল জাহাজ।

দশ

সেইদিনই রাত সাড়ে-আটটায় এল প্রথম আক্রমণ। কিন্তু আক্রমণটা ইয়াকুব বে কিংবা কোহেনের তরফ থেকে যে আসেনি, এটুকু হলপ করে বলতে পারে রানা। কারণ গত দু'ঘণ্টা একসাথে ছিল ওরা তিনজন। এবং সেই

কারণেই আরও শঙ্কিত হলো সে। ইয়াকুব এবং কোহেন ছাড়াও নির্দ্বিধায় খুন করবার মত আরও অন্তত একজন লোক আছে এ জাহাজে। তার থেকে সাবধান হতে হবে।

ঈজিয়ান সাগরে পড়েছে জাহাজ। চল্লিশ ঘণ্টায় পৌছতে হবে এথেন্সে, তাই খানিকটা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে স্পীড। নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রীদের সঙ্গে একসাথে ডিনার খাবেন বলে ক্যাপ্টেন আনসারী এসেছেন ডাইনিং হলে। কমোডোর জুলফিকার এইসব সামাজিকতা, মাপা-কথা, মাপা-হাসির ঘোর বিরোধী—তিনি নিজের কামরায় ডিনার খেয়ে নিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর নানান রকম আলাপ আলোচনা চলছে, পাকিস্তানী ডিশের চলছে অকুণ্ঠ প্রশংসা, কেউ কফিতে চুমুক দিচ্ছে, বিদেশীদের অনেকের হাতে মদের গেলাস। এমনি সময়ে উত্তেজিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করল ফোর্থ অফিসার নিজাম। দৌড়ে আসায় হাঁপাচ্ছে সে।

'একটু বাইরে আসবেন, স্যার? কথা আছে।' ইংরেজিতে বলল সে ক্যাপ্টেন আনসারীকে। ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে অন্তত পনেরো জোড়া চোখ চাইল ফোর্থ অফিসারের মুখের দিকে। অল্প বয়সী নিজামের মুখ লাল হয়ে উঠল সবার মনোযোগ ওর ওপর পড়তেই।

'কি কথা, বাছা?' পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। 'বাংলায় বলো, কেউ বুঝবে না। শান্ত গলায় বলো, অত উত্তেজিত না হলেও চলবে।'

'চীফ ওয়্যারলেস অপারেটার মিস্টার আলমাস মারা গেছেন, স্যার। ব্রিজ থেকে মেসেজ নিতে এসে কুতুবুদ্দিন দেখতে পেয়েছে মরে পড়ে আছেন তিনি ওয়্যারলেস রূমে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন আনসারী। ইয়াকুব খোঁচা দিল রানার পেটে। 'চীফ ওয়্যারলেস অপারেটার মিস্টার আলমাস' পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে সে।

'কি বলল ছেলেটা?' চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব।

'অপারেটার মারা গেছে ওয়্যারলেস রূমে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ইয়াকুব বে কোহেনকে বসে থাকবার ইঙ্গিত করে। রানাও উঠল ইয়াকুবের সাথে সাথে। ক্যাপ্টেন আনসারী তখন সৌজন্যমূলক ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

'মাফ করবেন, আমার এখুনি যেতে হচ্ছে—ডেকে পাঠিয়েছেন কমোডোর জুলফিকার। কাল আবার দেখা হবে। গুড নাইট।'

ইয়াকুব বে ততক্ষণে চলে গেছে ক্যাপ্টেনের কাছে। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার বন্ধুটি বাংলা জানেন। আমরা আপনার সঙ্গে আসতে

পারি?'

রানার দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার ক্যাপ্টেন আনসারী। বুঝলেন, এখন নিষেধ করতে গেলে কথা তো বাড়বেই, জানাজানি হয়ে যাবে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। ফলে হুড়মুড় করে সবাই এসে হাজির হবে ওয়্যারলেস রুমের কাছে—বিঘ্ন সৃষ্টি হবে কাজে। সাথে আসবার ইঙ্গিত করেই ছুটলেন ক্যাপ্টেন দ্রুতপায়ে ঘটনাস্থলের দিকে। নিজামকে পাঠিয়ে দিলেন কমোডোরকে ডেকে আনতে।

পথে দেখা হলো ডাক্তারের সঙ্গে। হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন তিনি রেডিও অফিসের দিকে। টেলিফোনে খবর পেয়েছেন তিনি।

টেবিলের ওপর ডান হাতটা রেখে তার ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে যেন লোকটা। বাম হাত ব্রিজ-টেলিফোনের কাছে চলে গেছে। ডান হাতটা ট্র্যান্সমিটিং কীর ওপর থাকায় অনবরত অর্থহীন ট্র্যান্সমিশন হচ্ছে। হাতটা একটু সরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, ট্র্যান্সমিশন বন্ধ হলো। প্রথমেই স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করলেন ডাক্তার, নাড়ী টিপে ধরলেন সেকেণ্ড দশেক, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'মারা গেছে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কিভাবে মারা গেল সেটাই প্রশ্ন,' বললেন ক্যাপ্টেন।

হঠাৎ বাংলায় কথা বলে উঠল রানা।

'লোকটাকে খুন করা হয়েছে। যারা করেছে তাদের দলপতি রয়েছে আমার পাশে। আমার পরিচয় পরে জানলেও চলবে, আপাতত এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে হবে। ডাক্তার আমাদের দলে।'

'কি বলছে লোকটা?' পিছন থেকে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কপাটের প্রায় সম্পূর্ণটা জুড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন কমোডোর জুলফিকার। সামলে নিয়েছেন বুদ্ধিমান ক্যাপ্টেন ততক্ষণে। উত্তরটা ইংরেজিতে দিলেন তিনি যাতে ঘরের সবাই বুঝতে পারে।

'উনি বলছেন ক্লিন কেস অভ হার্টফেল। অ্যাটাক্‌টা টের পেয়েই হাত বাড়িয়েছিল আলমাস ফোন করবার জন্যে—ঠিক সেই অবস্থায় মারা গেছে। অবশ্য ডাক্তার যে রায় দেবেন সেটাই ঠিক।'

'ঠিক বলেছেন ভদ্রলোক।' ঠোঁট, জিভ আর চোখ পরীক্ষা করে গম্ভীর ভাবে রায় দিলেন ডাকু চাচা। 'খুব সম্ভব সিরিব্রাল হেমোরেজ। তবে পোস্টমর্টেম না করে কিছু বলা যায় না। ঘণ্টা খানেক আগেই মারা গেছে

লোকটা।'

সবাই বেচারা আলমাসের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। অফিসারদেরকে মৃতদেহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবার সুযোগ দিয়ে ডাক্তার, রানা আর ইয়াকুব বে চলে গেল যে যার কামরায়। ডাইনিং হলও প্রায় খালি হয়ে গেছে। যোরা, হাসান খলীল বা কোহেনকে দেখতে পেল না রানা।

বিছানায় শুয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করল রানা আবোলতাবোল। কেন খুন করা হলো ওয়্যারলেস অপারেটারকে? কারণ একটা ভেবে চিন্তে দাঁড় করানো গেল, কিন্তু কে করল কাজটা? সবাই আজ উপস্থিত ছিল ডাইনিং হলে। বিশেষ করে কোহেন আর ইয়াকুব তো রানার সঙ্গেই ছিল। একমাত্র অনুপস্থিত ছিলেন পঙ্গু বৃদ্ধ পাপাগোস আর তাঁর নার্স। হুইল চেয়ারে করে ডাইনিং হলে গিয়ে খাওয়াটা বিসদৃশ দেখায় বলে তিনি নিজের কামরাতেই সেরে নিয়েছেন ডিনার। মিস সিলভিয়ার খাবারও ঘরেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে কি জাহাজের ক্রুদের মধ্যে কেউ আছে এর পিছনে?

ঠক্ ঠক্ ঠক্। মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। আস্তে করে ছিটকিনি খুলল রানা। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন ক্যাপ্টেন আনসারী। ঢুকে বল্টু তুলে দিয়ে ফিরলেন রানার দিকে। রানারই বয়সী। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর; স্মার্ট, সুঠাম চেহারা। টুপিটা খুলে এক হাতে ধরা। চুলগুলোয় ক্রু-কাট দেয়া। কোনও রকম ভূমিকা না করে সোজা প্রশ্ন করলেন তিনি রানাকে, 'কে আপনি?'

'মাসুদ রানা।'

'কি বললেন?' কুঞ্চিত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের ঘন কালো ভ্রূ জোড়া। 'মেজর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। চেনেন নাকি তাকে?'

'নিশ্চয়ই! দ্বারোকা মিশনের পর নেভির কে না জানে আপনার নাম? মাসুদ রানা তো কমোডোর জুলফিকারের সবচেয়ে প্রিয় দৃষ্টান্ত। কথায় কথায় এই দৃষ্টান্ত দেখান তিনি প্রত্যেকটি ন্যাভাল অফিসারকে। কিন্তু আপনি যদি মাসুদ রানা হবেন তাহলে তিনি চিনলেন না কেন আপনাকে?'

'ছদ্মবেশে আছি।'

'আপনি এই জাহাজে চলেছেন, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কমোডোর এসে হাজির হলেন ইস্তাম্বুলে, ব্যাপার কি বলুন তো? ভেতর ভেতর নিশ্চয়ই কোনও সিরিয়াস ব্যাপার ঘনিয়ে উঠেছে?' চিন্তাক্লিষ্ট দেখায় আনসারীকে।

'সব কথা বলবার এখন সময় হবে না—পরে একসময় বলব। একই ব্যাপারে এসেছি আমরা, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। খুব সম্ভব আমার উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই কমোডোরের।'

'যাক্‌গে। এখন বলুন আলমাসের মৃত্যুটাকে খুনই বা বলছেন কেন, আর সেটা চেপেই বা যাবার পরামর্শ দিলেন কেন? কমোডোর উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন ওঁর কেবিনে। নিজেই আসতে চেয়েছিলেন, আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে এসেছি। আমার আবার এক্ষুণি গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।'

'ওর ঘাড়ের পেছনে কলারের ঠিক নিচে লালচে দাগটা লক্ষ করেছেন?'

'করেছি।'

'প্রচণ্ড জোরে কোনও কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সেখানে।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে এমন কোনও একটা অত্যন্ত জরুরী খবর এসে পৌঁছেছিল যেটা জাহাজের কর্তৃপক্ষ জানতে পারুক তা চায়নি একজন লোক। খবরটা এতই জরুরী ছিল যে ব্রিজ মেসেঞ্জারের জন্যে অপেক্ষা না করে সেই মুহূর্তে খবরটা দেয়ার তাগিদ অনুভব করেছিল আলমাস—সেইজন্যে ওর বাঁ হাতটা চলে গিয়েছিল টেলিফোনের কাছে। এর প্রমাণও আছে। আপনি লক্ষ করেছেন, টেলিগ্রাফ বুকের অরিজিনাল ডুপ্লিকেট সহ কার্বন পেপারটাও খোয়া গেছে?'

'না তো, খেয়াল করিনি।'

'আমি করেছি। তারের ফাইলে গাঁথা আগের মেসেজের ডুপ্লিকেট কপিটাও আমি এক ফাঁকে পড়ে দেখেছি। সাধারণ ওয়েদার রিপোর্ট। ভূমধ্যসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়ে হারিকেনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এরকম হরহামেশাই হচ্ছে। কিন্তু টাইম লেখা আছে, উনিশ শো তেরো ঘণ্টা (১৯১৩ ঘণ্টা)। কিন্তু সাদা প্যাডটার ওপর পেন্সিলের চাপে টাইম লেখার জায়গায় দুটো অক্ষর কেবল পড়া যাচ্ছে—৪৭.অর্থাৎ সাতটা সাতচল্লিশ মিনিটে আরেকটা মেসেজ এসেছিল, এবং তা লেখাও হয়েছিল: অপারেটারকে খুন করে কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাতা দুটো। ওদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ছিল সে খবরটা।'

'কিন্তু কি মেসেজ এল তা বাইরের কোনও লোক জানবে কি করে?'

'তাদের কাছেও ওয়্যারলেস সেট থাকা অসম্ভব নয়।'

'এখন কি করা যায়? কিছুই তো বুঝতে পারছি না, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'সাদা প্যাডটায় কি লেখা হয়েছিল সেটা জানা দরকার। ওটা আলাদা করে রেখে দিন, এথেন্স পৌঁছেই পুলিসের সাহায্য নিয়ে পাউডার ছড়ালে বেরিয়ে পড়বে খবরটা। আর রেডিও রুমের আশপাশে, যেখান থেকে কোনও গোপন ওয়্যারলেস সেটে খবর পেয়ে এক মিনিটের মধ্যে রেডিও রুমে পৌঁছানো যায়, এমন প্রত্যেকটি রুম সার্চ করবার ব্যবস্থা করুন—যাত্রীদের

অসুবিধা হয় হোক।'

'এটা যে খুন সেকথা চেপে যেতে বললেন কেন?'

'তার কারণ, সেটা আপনারা বুঝে ফেললে সাবধান হয়ে যাবেন; খুনীও আরও সাবধান হয়ে যাবে। আপনারা এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিয়েছেন জানলে অসাবধানে খুনীর ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। ভাল কথা, আলমাসের বদলে যাকে রেডিও রুমে পাঠিয়েছেন তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন?'

'না তো!'

'এক্ষুণি সে ব্যবস্থা করতে হবে। সেই একই খবর দ্বিতীয়বার আসতে পারে। যদি তাই হয়, সাবধান না হলে দ্বিতীয় অপারেটারকেও আক্রমণ করবে ওরা।'

বিচলিত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। শুধু আর একটা কথা। কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'আমি যাদের পিছনে লেগেছি তারা আমার সঙ্গেই ছিল খুনের সময়। অর্থাৎ ওদের আরও লোক আছে—আপনাদের ক্রুদের কেউও হতে পারে। যাত্রীদের সবাই ছিল তখন ডাইনিং হলে। পঙ্গু বৃদ্ধ পাপাগোস আর কমোডোর জুলফিকার ছাড়া সন্দেহ করবার মত লোক দেখতে পাচ্ছি না। কথাটা বলবেন ওঁকে।'

হাসলেন ক্যাপ্টেন আনসারী। তারপর হাতের টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রানা দেখল, আশ্চর্য কোনও উপায়ে আলমাসের মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে জাহাজের প্রত্যেকটি যাত্রীর মধ্যে। যেখানেই জাহাজের কোনও অফিসারকে পাচ্ছে ছেঁকে ধরছে ছয়-সাত-আট জন, জর্জরিত করে তুলছে তাকে প্রশ্নবাণে। বিভিন্ন অফিসারের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য শুনে সংবাদটাকে একটা গোলমেলে রূপ দিয়ে জল্পনা চলছে জাহাজময়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ডেক চেয়ারে বসে সাগর দেখছে রানা। নির্মেঘ আকাশ। যতদূর দেখা যায় সুনীল জলরাশি। বহুদূরে ছোট ছোট এক আধটা দ্বীপ ভেসে উঠেছে ঈজিয়ান সাগরের তলা থেকে বুদ্বুদের মত। সবুজ এক-একটা মরুদ্যানের মত লাগছে ওগুলোকে দেখতে। সমুদ্রের একঘেয়ে কল্লোল আর শীতকালীন দুপুর-রোদের আমেজে ঝিমিয়ে আসছে রানার দেহ মন। আরেকটু হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় চোখ বন্ধ করবার উপক্রম করছে সে, হঠাৎ একটা লাল কাপড়ের ঝিলিক দেখতে পেয়ে পূর্ণ সজাগ হয়ে

চোখ মেলল।

যোরা হাসান। লাল একটা ফ্রকের মাঝ বরাবর কালো বেল্ট বাঁধা। অত্যন্ত উত্তেজিত ওর চোখ মুখ।

'বসতে পারি, রানা?' উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই বসে পড়ল যোরা পাশেই একটা চেয়ারে।

'কি ব্যাপার, যোরা? চিনলে কি করে আমাকে? তাছাড়া তোমাকে এভাবে খোলাখুলি আমার সাথে দেখলে...'

'কিছু হবে না। যা হবার হয়ে গেছে। তুমি ধরা পড়ে গেছ, রানা। টের পেয়ে গেছে ওরা তোমার পরিচয়।'

'কি করে?'

'কাল রাতে একটা মেসেজ এসেছে তোমার সম্পর্কে। সব জেনে ফেলেছে ওরা।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আব্বার সামনেই ওরা এ নিয়ে আলাপ করছিল। একবিন্দুও বিচলিত হয়নি ইয়াকুব বে তোমার সত্যিকার পরিচয় জেনে। বলেছে; এখন আর ওকে ঠেকাবার ক্ষমতা খোদ্ শয়তানেরও নেই। দশটা মাসুদ রানা এলেও সে পরোয়া করে না। তোমার ঘর থেকে কাল রাতে ক্যাপ্টেনকে বেরিয়ে যেতে দেখে মুচকি হেসেছে শুধু।'

ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয়ে গেল রানার। বাইরের দিকে চেয়ে চুপচাপ ভাবছে সে। ভেতর ভেতর অস্থিরতায় ভুগছে যোরা। সে-ই আবার কথা বলল। উৎকণ্ঠা আর চেপে রাখতে পারছে না।

'আমি বেশ বুঝতে পারছি, রানা, ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের চারপাশে। জাহাজের মধ্যে খুন-খারাবি আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার খুব ভয় করছে, রানা।'

'খুন? কে খুন হলো?'

'তুমি জানো না? ফার্স্ট অফিসার এহসানকে কিছুক্ষণ আগে পাওয়া গেছে রেডিও রূমে। মৃত। গুলি করে খুন করা হয়েছে তাকে! আমি কিছুক্ষণ আগে মিস সিলভিয়াকে ওইদিক থেকে আসতে দেখেছি।'

সোজা হয়ে গেল রানার মেরুদণ্ড। 'মেয়ে মানুষ তার ওপর নার্স...

'মেয়ে না পুরুষ তা আমি জানি না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিল যোরা। 'তবে একটা ব্যাপার তোমাকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি—সারাক্ষণ ব্যস্ত ভাবে উল বুনে চললেও নিটিং-এর 'ন'-ও জানে না ও। আবোলতাবোল কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছে কেবল। তাছাড়া, মেয়েমানুষ কি পিস্তল ছুঁড়তে পারে না?'

রানার মনে হলো হঠাৎ ওর মনের দরজাটা খুলে যেতেই যেন একরাশ আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর মনের অন্ধকারে। সেই আলোয় অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। ইঙ্গিতে বসতে বললেন ওকে কমোডোর জুলফিকার। কখন নিঃশব্দ পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি টের পায়নি রানা বা যোরা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রানার সামনে বসলেন তিনি। মুচকে হাসলেন রানার নিখুঁত ছদ্মবেশ দেখে। হাসির আড়ালে একটা উৎকণ্ঠিত বিধ্বস্ত ভাব রানার চোখ এড়াল না।

'কি ব্যাপার, রানা? তুমি আমাদের সঙ্গে আছ সেটা খুশির কথা, ভরসারও কথা। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কি?'

সব ভেঙে বলল রানা। শুনে গুম হয়ে গেলেন কমোডোর জুলফিকার।

'চীফ অফিসার এহসান নাকি…'

'হ্যাঁ।' প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিলেন কমোডোর। 'দুটো গুলিই হার্ট ফুটো করে ঢুকে গেছে। এবং তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ট্রান্সমিটার, রিসিভার সব খতম করে দিয়ে গেছে ওরা যাবার আগে। তার ছেঁড়া, কনডেন্সার, ভাল্‌ভ্ সব এমন ভাবে গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে যে কারও সাধ্য নেই রিপেয়ার করে। কাবার্ডের মধ্যে একটা ইমারজেন্সী সেট ছিল—সেটাও শেষ। এহসান ছিল ব্রিজে ডিউটিতে। রেডিও রুমে তালা মেরে খেতে গেছিল অপারেটার। সেই সুযোগে রেডিও রুমে কাউকে ঢুকতে দেখে ওর সন্দেহ হয় খুব সম্ভব—কাউকে কিছু না বলে সে নেমে যায় ব্রিজ থেকে। হুইল হাউজে প্রথম এহসানের খোঁজ পড়ে কোর্স-অলটারেশনের জন্যে। খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন আনসারী খুঁজে বের করেছে মৃতদেহটা।'

যোরাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে চাপা গলায় পনেরো মিনিট আলাপ করল রানা ও কমোডোর জুলফিকার। আলোচনার শেষে বার কয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে চলে গেলেন কমোডোর।

বেশ খানিকটা দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে টিটকারীর ভঙ্গিতে বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল ইয়াকুব বে। রহস্যময় একটা বিচিত্র হাসি হেসে সরে গেল সে থামের আড়াল থেকে।

এগারো

আজ প্রত্যেককে ডাইনিং হলে আসবার অনুরোধ জানানো হয়েছে বিশেষ

ভাবে। জাহাজে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ডিনারের পর সমবেত যাত্রীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ক্যাপ্টেন আনসারী।

এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে গোটা জাহাজে। যাত্রীরা মনে করছে জাহাজের ভেতর যে-সব অস্বাভাবিক ঘটনার গুজব শোনা যাচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে কোনও দায়িত্বশীল অফিসারের মুখে শুনবার অধিকার তাদের আছে। প্রস্তাবটা এসেছে জনাব হাসান খলীলের কাছ থেকে যোরার প্ররোচনায়। সম্মত হয়েছেন ক্যাপ্টেন। সাইক্লোস্টাইল করে তৈরি হয়েছে আমন্ত্রণ-পত্র। ভদ্রতা করে রানাকেও দেয়া রয়েছে এক কপি। প্রস্তুত হয়েছে রানা রাত্রির জন্যে।

বেশ বড়সড় ডাইনিং হল। লম্বা দুই সারি কোলাপসিবল্ টেবিল ফিট করে তার দু'পাশে চেয়ার সাজানো। একটা টেবিলের এক মাথায় বসেছেন ক্যাপ্টেন আনসারী, আরেক মাথায় কমোডোর জুলফিকার, অপরটার দুই মাথায় সেকেন্ড ও থার্ড অফিসার। অর্থাৎ, দুটো এন্ট্রান্সই গার্ডেড। বয় বেয়ারা ছাড়াও কিছু লোককে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। প্রায় নিঃশব্দে ডিনার খেয়ে নিল সবাই। মন পড়ে আছে ভাষণের দিকে, তাই পাকিস্তানী ডিশের প্রশংসা আজ আর শোনা গেল না কারও মুখে।

রানা বসেছে পঙ্গু পাপাগোসের পাশে। ক্যাপ্টেনের কাছাকাছি বসেছে ইয়াকুব বে ও কোহেন। কমোডোরের হাতের বাঁয়ে বসেছে মিস্ সিলভিয়া পাপাগোসের মুখোমুখি। হাসান খলীল এবং যোরা বসেছে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায়।

খাওয়া শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। স্তব্ধ হয়ে গেল ডাইনিং হলের মৃদু গুঞ্জন। সবার অলক্ষে উঠে দাঁড়াল সেকেন্ড ও থার্ড অফিসার।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টল্মেন!' পাঁচ সেকেন্ড চুপ করে রইল সে। 'আজ আমার বক্তব্য আমি নাটকীয় ভাবে পেশ করতে চাই আপনাদের কাছে।' রানা লক্ষ করল ইয়াকুব ও কোহেন পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। আবার শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। 'নাটকের যে দৃশ্যটা এখন অভিনীত হবে তাতে খানিকটা ধস্তাধস্তি আছে, আশাকরি সেটা দেখে আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না, এর তাৎপর্য অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারবেন।' একটানে একটা কোল্ট অটোমেটিক পিস্তল বের করলেন ক্যাপ্টেন জ্যাকেটের ভিতর লুকানো হোলস্টার থেকে। বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন, 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও ইয়াকুব, কোহেন, পাপাগোস আর সিল্ভিয়া। এক বিন্দু নড়াচড়া করলে...'

কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিল পঙ্গু পাপাগোস। সিটিং হাই জাম্পে ওয়ার্লড রেকর্ড ব্রেক করে ফেলত, কিন্তু তার আগেই কমোডোর

জুলফিকারের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে চেয়ার সহ। পড়েই বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল।

নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে যে ছোট্ট যন্ত্রটা আজ সন্ধ্যায় পৌঁছে দেয়া হয়েছিল ওর কামরায় সেটা এখন শোভা পাচ্ছে রানার হাতে। চট্ করে একপাশে সরে গেল রানা। পেয়ালার মধ্যেকার গরম কফিটুকু ছুঁড়ে দিয়েছে সিল্‌ভিয়া রানার মুখের উপর—রানা সরে যেতেই সবটুকু গিয়ে পড়ল পাপাগোসের মুখে। কিন্তু রানা ফিরে চাইল না পিছন দিকে। চাইবার সময় নেই। উলের ব্যাগের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে মিস সিল্‌ভিয়া। গর্জে উঠল রানার হাতের পিস্তল। উঠে দাঁড়াল সিল্‌ভিয়া, পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল খানিকটা, তারপর হুড়মুড় করে ধসে পড়ল চেয়ারের ওপর বেকায়দা ভঙ্গিতে।

পিস্তলের প্রচণ্ড শব্দটা মিলিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন আনসারীর পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'একবিন্দু নড়েছ কি খুন হয়ে যাবে!'

এতখানি বোধহয় ইয়াকুবও আশা করতে পারেনি। ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল ওর। বেরিয়ে এল ভিতরের পশু। বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে, মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। এখন চালে একটু ভুল হলেই ঠেলে পার করে দেয়া হবে ওকে বেড়াটুকু। রানা লক্ষ করল, কোহেনের মুখ তেমনি নির্বিকার।

'সরে দাঁড়াও টেবিল থেকে। দু'জনই!' আবার আদেশ দিল ক্যাপ্টেন।

ধীরে ধীরে সরে গেল ওরা দু'জন টেবিল থেকে। হঠাৎ ঝিক্ করে উঠল একটা ছুরি ঘরের উজ্জ্বল আলোয়। প্রস্তুত ছিল আনসারী, কিন্তু সরে যাবার সময় পেল না। সোজা গিয়ে বিঁধল ছুরি ওর ডান বাহুতে ইউনিফরম ভেদ করে।

'বুম!' ছুরির দিকে দৃকপাত না করে গুলি ছুঁড়ল ক্যাপ্টেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ইয়াকুব ওর ফুটো হয়ে যাওয়া হাতের দিকে। রক্ত ঝরছে সেখান থেকে টপ টপ করে।

'তোমাকে এক্ষুণি খুন করতে পারতাম, কিন্তু আমি খবরের কাগজে তোমার বিচারের শুনানী পড়তে চাই। ফাঁসিকাঠের জন্যে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছি।'

উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার ছেড়ে। নারী কণ্ঠে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। আরেকজন কণ্ঠ যোগ করল তার সঙ্গে। হিস্টিরিয়ার পূর্ব লক্ষণ।

'চিৎকার বন্ধ করুন!' ধমকে উঠলেন কমোডোর জুলফিকার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে। এক ধমকে থেমে গেল দ্বৈত-সঙ্গীত।

আবার নিস্তব্ধতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হাসান খলীল। এগিয়ে

আসছেন তিনি রানার দিকে। ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'মেয়েটাকে খুন করলেন আপনি। সবার চোখের সামনে···। আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, অবলা মেয়েমানুষ!' অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি রানার দিকে। 'খুন···'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। থামিয়ে দিল ওঁকে রানা। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষের বাপ!' একটানে নার্সের টুপি সরিয়ে চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই পরচুলা উঠে এসে বেরিয়ে পড়ল চমৎকার একখানা পালিশ করা টাক। 'কী অপরূপ মেয়েমানুষ! খাস কাশ্মীর থেকে আমদানী। আর এই দেখুন।' উলের ব্যাগের মধ্যে থেকে বের করে আনল রানা একখানা বেরেটা অটোমেটিক। 'এটাই বের করতে যাচ্ছিলেন আপনার অবলা নারী।'

সেকেন্ড আর থার্ড অফিসার ততক্ষণে ইয়াকুব আর কোহেনকে নিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেন আনসারীর পিছন পিছন। আবার হুকুম ছাড়লেন কমোডোর জুলফিকার।

'সবাই সরে যান দূরে। কেউ এগোবার চেষ্টা করবেন না। এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক। লাফিয়ে আপনাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারে। আনসারী, এই কুকুরটাকে তক্ষুণি শেষ করে দেয়া উচিত ছিল। এরপর কেউ গুলি ছুঁড়লে মাসুদ রানার মত হত্যার উদ্দেশ্যে ছুঁড়বে। এটা আমার আদেশ। সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। ডাক্তার, প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র নিয়ে এসে এই লোকটার হাতের একটা ব্যবস্থা করুন।' ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যাত্রীদের উদ্দেশে আবার বললেন তিনি, 'আপনাদের সামনে এই বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ডটা করতে হলো বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না।'

'কিন্তু, কিন্তু···এই খুন। নিরীহ যাত্রীদের এভাবে আক্রমণ করে বসা···' একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ কথা বলে উঠলেন এতক্ষণ পর। খুনের পক্ষে বা বিপক্ষে জীবনে প্রচুর যুক্তিতর্কের জাল বুনেছেন তিনি, কখনও স্বচক্ষে খুন হওয়া দেখেননি আগে—তাই এতক্ষণ হতবাক হয়ে ছিলেন, এইবার মুখ খুললেন। জাহাজের অফিসাররা মিলে হঠাৎ হামলা চালাবে তাঁর সহযাত্রীদের উপর, সেটা তিনি স্বচক্ষে দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না।

'গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই জাহাজের দুইজন অফিসারকে খুন করেছে এরা, সে খবর রাখেন? আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর কয়জনকে হত্যা করা হত কে জানে?' বললেন কমোডোর জুলফিকার।

'কিন্তু বৃদ্ধ পঙ্গু পাপাগোস কি অন্যায় করেছেন যে···'

'আমাদের যতদূর বিশ্বাস পাপাগোস বৃদ্ধও নয়, পঙ্গুও নয়। সেটা অল্পক্ষণেই প্রমাণ হয়ে যাবে ওর জ্ঞান ফিরে এলে। খুব সম্ভব ও-ই হচ্ছে এই দস্যুদলের দলপতি। অ্যাই, তোমরা এদিকে এসে দাঁড়াও।' ইয়াকুব আর কোহেনের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়লেন কমোডোর। এগিয়ে এল ওরা। রানা দেখল ইয়াকুবের চোখে জ্বলজ্বল করছে জিঘাংসা। আর কোহেনের চোখ তেমনি নির্বিকার। ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসির আভাস—যেন এইসব ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছে সে ভিতর ভিতর। সতর্ক হয়ে গেল রানা--এ লোক গোক্ষুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। 'আনসারী, তুমি রেডি থাকো পাপাগোসের জন্যে। রানা, দেখো তো ব্যাটাদের কাছে কোনও অস্ত্র আছে নাকি?'

'দেখছি, স্যার।' কোহেনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কোটের কলার ধরে একটানে নামিয়ে আনল নিচে। শোলডার হোলস্টার থেকে বের করে নিল একটা ল্যুগার পিস্তল। দক্ষ হাতে পরীক্ষা করে দেখল আর কিছু নেই ওর দেহে। ইয়াকুবের কাছে কোনও অস্ত্র পাওয়া গেল না।

রানার পরীক্ষা শেষ হতেই মুখ খুললেন কমোডোর।

'চমৎকার। আর দুই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা এথেন্স। এই তিনটেকে ততক্ষণের জন্যে আচ্ছা করে বেঁধে রাখতে হবে। রশি নিয়ে এসো তো, নিজাম।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

দুই পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল নিজাম। ঠা-ঠা-ঠা-ঠা করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ এল মেশিনগানের। মনে হলো আওয়াজটা যেন ব্রিজ থেকে আসছে। হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি।

রানাই সামলে নিল সবচাইতে আগে। একলাফে কোহেনের পিছনে চলে এল সে। বাম হাতে গলা জড়িয়ে ধরে পিস্তলটা ঠেসে ধরল ওর কপালে। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কোনও রকম চালাকি চাই না। স্রেফ খুন করে ফেলব।'

চারদিক নিশ্চুপ। পাঁচ সেকেন্ড পার হয়ে গেল। তারপর তীক্ষ্ণ বিকৃত নারী কণ্ঠে ককিয়ে উঠল কে যেন। ভয়ানক ভয় পেয়েছে মহিলা। থেমে গেল শব্দটা—বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আবার নিস্তব্ধতা। তারপর ঝনঝন করে প্রায় একসাথে ভেঙে গেল ডেক সাইডের সবক'টা জানালার প্লেট-গ্লাস। পরমুহূর্তে দড়াম করে লাথি পড়ল দরজায়—দু'পাট খুলে গেল দরজা।

'পিস্তল ফেলে দাও মাটিতে। প্রত্যেকে…এক্ষুণি।' ইয়াকুবের পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'নইলে ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী খুন হয়ে যাবে। ম্যাসাকার হয়ে যাবে সব।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল লাইট।

চারটে জানালার ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে চকচকে চারটে সাব-মেশিনগানের নল্ দেখা যাচ্ছে। ফরসা হাতও দেখল রানা আবছা মত, বাঁকা ম্যাগাজিনও চোখে পড়ল। পঞ্চম ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজা জুড়ে—তার হাতেও সাব-মেশিনগান।

ইয়াকুব বে কেন পিস্তল ফেলে দিতে বলেছিল বুঝল রানা পরিষ্কার। যুদ্ধ শেষ। এখন কিছু চেষ্টা করতে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল। কিচ্ছু করবার নেই এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া। এইজন্যেই সে বলেছিল খোদ্ শয়তানও এখন আর ঠেকাতে পারবে না ওকে। নিঃসন্দেহে হেরে গেছে ওরা।

মুঠি আলগা করে ফেলে দিতে যাচ্ছিল সে পিস্তলটা। হঠাৎ চমকে উঠে দেখল ঝট্ করে ঘুরে দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে পিস্তল তাক করেছেন কমোডোর জুলফিকার। খেপে গেছেন তিনি—ভয় কাকে বলে জানা নেই তাঁর; অবস্থা বিচার করে দেখলেন না, চোখের সামনে দাবার ছক পাল্টে যেতে দেখে হারিয়ে ফেললেন মানসিক ভারসাম্য। সামান্য একটু ভুলে ঘরের প্রত্যেকটি লোককে বিপদের মুখে টেনে আনছেন তিনি।

রানা চিৎকার করে সাবধান করবার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। এক ঝট্কায় কোহেনকে একপাশে সরিয়ে লাফিয়ে ধরতে চেষ্টা করল রানা কমোডোরের হাত।

'বুম!' ছুটে গেল এক টুকরো তপ্ত সীসা, বাঁকা হয়ে গেল দরজার সামনে দাঁড়ানো ভয়ঙ্কর দর্শন লোকটা, পড়ে গেল সে মুখ থুবড়ে সাব-মেশিনগানটা আঁকড়ে ধরে। ওটা ব্যবহার করবার ক্ষমতা নেই আর ওর মধ্যে।

রানা দেখল জানালা দিয়ে একটা মেশিনগান সোজা তাক করেছে কমোডোরের দিকে। যতবড় বোকামির কাজই করে থাকুন না কেন, এইভাবে কমোডোরকে হত্যা করা হচ্ছে, চুপচাপ দেখে যেতে পারে না রানা। এক সেকেন্ডে পর পর দু'বার অগ্ন্যুদ্গার করল রানার কোল্ট অটোমেটিক। হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠল যেন মেশিনগানটা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল তিনটে মেশিনগান। প্রকাণ্ড একখানা হাতুড়ি দিয়ে রানার বাম উরুর ওপর আঘাত করল যেন কেউ। ছিট্কে পড়ল সে বারের কাউন্টারের ওপর। কাউন্টারের ব্রাস-রেইলের সঙ্গে জোরে ঠুকে গেল মাথাটা। জ্ঞান হারাল মাসুদ রানা।

সমাধির নিস্তব্ধতা। সারা ঘরে করডাইটের উৎকট গন্ধ।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার। চোখ মেলে চাইল সে। প্রথমে কিছুই

দেখতে পেল না। বহুকষ্টে উঠে বসল কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে। মাথাটা বার কয়েক এদিক ওদিক ফেরাল। দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। প্রথমেই দেখতে পেল সে যাত্রীদের। সবাই পড়ে আছে কার্পেটের উপর। ধ্বক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। সবাই মারা পড়েছে! না, নড়ে উঠল একজন। কচ্ছপের মত মাথাটা এদিক ওদিকে ঘুরিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে সে বর্তমান পরিস্থিতি ভীত-চকিত দৃষ্টি মেলে। অন্য কোনও সময়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর মনে হত রানার কাছে, কিন্তু এখন হাসি পেল না ওর। বুঝল প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই সটান শুয়ে পড়েছে মাটিতে।

রানার পাশেই পড়ে আছেন ক্যাপ্টেন আনসারী। লাল হয়ে উঠেছে প্যান্ট হাঁটুর কাছটায়। কাঁধেও বোধহয় লেগেছে গুলি—রঙ ধরছে জ্যাকেটটাতেও। রানা বুঝল মারাত্মক জখম হয়েছে, কিন্তু মারা পড়েননি ক্যাপ্টেন।

ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে চাইল এবার। ইয়াকুব আর কোহেন দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেখানটায় ছিল সেখানেই। কোহেনের হাতে ওর প্রিয় ল্যুগার পিস্তলটা, ইয়াকুবের হাতে রুমাল জড়ানো। ওদের পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কয়েকজন।

ফোর্থ অফিসার লাজুক নিজাম চিত হয়ে মরে পড়ে আছে। সারাটা বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মেশিনগানের গুলিতে। সেকেন্ড ও থার্ড অফিসারও পড়ে আছে মাটিতে, কিন্তু অন্যদিকে ফিরে থাকায় ওদের জখমের গুরুত্ব বুঝতে পারল না রানা।

বসে আছেন কমোডোর জুলফিকার। রানা বুঝল, বাঁচবেন না তিনি। সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় বসে আছেন কমোডোর—ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা, কিন্তু সে মুখে বিচিত্র এক টুকরো অস্বাভাবিক হাসি। কাঁধ থেকে নিয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত ডান ধারটা রক্তে ভিজে চুপচুপে। গুলি কোথায় কোথায় লেগেছে বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু অন্তত একটা গুলি যে লাংসে লেগেছে তা বুঝতে পারল সে ব্যথায় ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটোর মধ্যে লাল বুদ্বুদ দেখে।

কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। কেন জানি এই দুঃসাহসী পাঠান বৃদ্ধকে ভিতরে ভিতরে ভালবেসে ফেলেছিল রানা। বাচ্চা ছেলে নিজামের ওপর দৃষ্টি গেল আবার। এরা কেউই চায়নি এই রক্তারক্তি—জোর করে চাপানো হয়েছে এদের ওপর এই নির্মম মৃত্যু। ইয়াকুব, কোহেন আর পাপাগোসের দিকে চাইল রানা নিরুৎসুক নেত্রে। ভিতর ভিতর বজ্রকঠিন একটা শপথ নিল সে। রানার ভাগ্য ভাল যে এই শপথের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না ওরা—পেলে

এই মুহূর্তে ওকে হত্যা করে পথ নিষ্কন্টক করে ফেলত।

নিজের বাম পায়ের দিকে চাইল এবার রানা। নীল প্যান্টটা ভিজে গেছে। আঙুল দিয়ে খুঁজে খুঁজে তিনটে গর্ত আবিষ্কার করল সে। কাছাকাছি তিনটে গুলি ঢুকেছে রানার উরুতে। ভাবল, কোনও আর্টারি ছিঁড়ে না গিয়ে থাকলেই হয়।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন!' মাটিতে শোয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর উদ্দেশে বলল ইয়াকুব। 'এই বিতিকিচ্ছিরী ঘটনার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। কমোডোর জুলফিকারের নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এই নির্বিচার হত্যা সংঘটিত হলো। দোষ আমার নয়। যাক্, আর ভয়ের কিছুই নাই, উঠে দাঁড়ান আপনারা।'

উঠে পড়ল সবাই যন্ত্রচালিতের মত। হাসান খলীলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যোরা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার পায়ের দিকে।

'তোমার ভাষণ পরে দিলেও চলবে, ইয়াকুব বে,' হঠাৎ বলে উঠল রানা। 'শিগ্‌গির ডাক্তারকে ডেকে পাঠাও। বুকে গুলি খেয়েছেন কমোডোর।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রইল ইয়াকুব কয়েক সেকেন্ড, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার কমোডোরকে, আবার চাইল রানার পায়ের দিকে।

'বীর জাতির বীর সন্তান আপনি, মেজর মাসুদ রানা। নিজের জখম পা নিয়েও কমোডোরের মুখের রক্ত-বুদ্বুদ দেখতে পাওয়া আপনার মত মানুষকেই সাজে। ডাক্তার ডাকতে বলছেন, সে-ও নিজের জন্যে নয়, অন্যের জন্যে। আশ্চর্য! দেশের গৌরব আপনি। কিন্তু বড় ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন এবার আপনারা। ও হ্যাঁ, ডাক্তার আসছেন। আমার জন্যে ওষুধ আনতে গেছেন তিনি কমোডোরের আদেশে। এসে পড়বেন এক্ষুণি।' প্যাসেঞ্জারদের দিকে ফিরল ইয়াকুব বে। 'আপনাদের আর কোনও ভয় নেই। এম. ভি. রুস্তম এখন সম্পূর্ণ আমার দখলে—আমি অভয় দিচ্ছি, কোনও চিন্তা করবেন না আপনারা। আপনাদের কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও আক্রোশ নেই। আমার প্রয়োজন আসলে জাহাজটা। আগামী তিন চার দিনের মধ্যেই আপনাদের নিরাপদে অন্য একটা জাহাজে তুলে দেয়া হবে। কিন্তু এই ক'দিন আপনাদেরকে এই ঘরের মধ্যেই থাকতে, খেতে, এবং শুতে হবে: প্রত্যেকটা কেবিনের জন্যে আলাদা গার্ডের ব্যবস্থা করতে পারব না। আপনাদের বিছানাপত্র এখানেই এনে দেয়া হবে। এই ঘরের চারদিকে প্রহরার ব্যবস্থা থাকবে। আপনারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই ক'টা দিন আশাকরি আনন্দেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। এই যে ডাক্তার এসে গেছেন...' হাত বাড়িয়ে দিল ইয়াকুব ডাক্তারের দিকে। রুমালটা সরিয়ে বলল, 'দেখুন দেখি কি করতে পারেন?'

ঘরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার। চারপাশে চাইলেন বোকার মত। ব্যাপারটা বুঝতে বেশি দেরি হলো না তাঁর।

'চুলোয় যাক তোমার হাত!' খেপে উঠলেন তিনি হঠাৎ। এগোলেন কমোডোর জুলফিকারের দিকে। 'তোমার চেয়ে অনেক সিরিয়াস···'

'তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই করো!' বাধা দিয়ে গর্জে উঠল কোহেন। হাতে উদ্যত রিভলভার। থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার কোহেনের হাতের মৃদু ধাক্কা খেয়ে।

'ডাক্তার!' বললেন হাসান খলীল। 'ওরা যা বলছে তাই করো।'

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন ডাক্তার। রানার দিকে চাইলেন একবার। রানা মাথা ঝাঁকাল। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, এসো এদিকে।'

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন ক্যাপ্টেন আনসারী। রানার চোখে চোখ পড়ল তাঁর। চাপা কণ্ঠে দ্রুত কয়েকটা বাক্য বিনিময় হলো ওদের মধ্যে, সবার অলক্ষে।

এমন সময় একজন লোক ঢুকল একটা চার্ট হাতে নিয়ে। ইয়াকুব বলল, 'এটা ওই ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাও। ক্যাপ্টেন আনসারী, আমরা এখন এথেন্সের কাছাকাছি এসে পড়েছি। কিন্তু কোনও পোর্ট না ছুঁয়ে সোজা জিব্রাল্টার দিয়ে আটলান্টিকে বেরোতে চাই আমি। দয়া করে একটু কষ্ট করতে হবে। শর্ট-কাট একটা কোর্স বের করে দিতে হবে আপনাকে। নেভিগেশন আমারও জানা আছে, কিন্তু অনভ্যাসে মরচে ধরে গেছে একটু।

'খেপেছ নাকি, বদমাইশ? তোমার হুকুম তামিল করব আমি মনে করেছ?'

'যদি না করেন, জাহাজের প্রত্যেকটি অফিসার আর ক্রুকে আমি গুলি করে খুন করব আপনার চোখের সামনে। সেটাই কি ভাল হবে?'

রানা হঠাৎ বলে উঠল, 'যা বলছে তাই করুন, ক্যাপ্টেন আনসারী।'

'ঠিক পথ?' বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'নিশ্চয়ই। নইলে ধরে ফেলবে ও।'

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো এদিকে।'

শুয়ে শুয়েই চার্টটা বিছিয়ে পেন্সিল, প্যারালেল রুলার ও ডিভাইডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। রানার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু হাসল ইয়াকুব। বলল, 'আস্‌লি ঘোড়ে কো এক চাবুক! নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। বুদ্ধিমান লোকের সাথে কাজ করবার মত আনন্দ আর নেই। আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আরও কাজে আপনাকে লাগবে আমার।'

'আর কোনও কাজে লাগতে পারব বলে আমার ভরসা নেই,' তিক্তকণ্ঠে বলল রানা। 'আমার থাইবোন ভেঙে গেছে।'

'কি বললেন?' চোখ দুটো একটু ছোট হলো ইয়াকুবের।

'ভাঙা হাড়ে ঘষা লেগে কড়কড় করছে ভেতরটা।' মুখ বিকৃত করল রানা।

'আমি আপনার জন্যে দুঃখিত হতাম, যদি না আপনার গুলিতে আমার দুই-দুইজন লোক মারা যেত। কোহেন, রাডার আর এঞ্জিনরুম চেক করো। ডিউটি ছাড়া যত লোক আছে তাদের ওপর কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করবে। মনে রেখো এরা কোন্ দেশী: সহজে বশ্যতা স্বীকার করবার জাত নয়। কোথাও কোনও গোলমাল দেখলে মুখে নয়, পিস্তল দিয়ে কথা বলবে। ওই চার্টটা নিয়ে যাও ব্রিজে, দেখবে যেন ঠিক সময় মত ঠিক পরিমাণে কোর্স অলটারেশন করা হয়। রাডার অপারেটারকে বলবে যেন স্ক্রীনের ওপর কড়া নজর রাখে—কিছু নজরে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করবে। দুইজন লোক পাপাগোসকে নিয়ে যাবে ওর কেবিনে। আধঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।' কোহেন বেরিয়ে যেতেই ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, 'এই লোকগুলোকে আপনার সার্জারী রুমে নিয়ে যাবার ঝুঁকি নেবেন, না এখানেই চিকিৎসা করতে চান?'

'প্রত্যেককে নিতে হবে "সিক-বে"তে। তোমাকেও। টেম্পোরারি ব্যান্ডেজ করে দিলাম, কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার আঙুলে ছোট্ট একটা অপারেশন না করলে পুরো হাতটাই কাটা যেতে পারে।'

'এক ঘণ্টা কেন, এক্ষুণি চলুন না।'

'কমোডোর, কেমন বোধ করছেন এখন?' ডাক্তার এগিয়ে গেলেন কমোডোরের দিকে। রক্তশূন্য হয়ে গেছে কমোডোরের মুখ। হাসবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু মুখ বিকৃতির মত লাগল দেখতে। কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কথা বেরোল না, আরও কয়েকটা রঙীন বুদ্বুদ দেখা গেল দুই ঠোঁটের মাঝখানে।

কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললেন ডাক্তার কমোডোরের শার্ট, পরীক্ষা করে বললেন, 'এঁকেও নিতে হবে নিচে, কিন্তু সাবধানে, বুকের ওপর চাপ পড়লেই জান বেরিয়ে যাবে।' বাকি তিনজনের দিকে একনজর চেয়েই ফিরলেন তিনি রানার দিকে। ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস বা পাল্স্ বিট্ পরীক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না তিনি। রানা বুঝল ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা পাল্স্ বিট্ এখন অতীতের ব্যাপার।

'খবরদার, আমার পা ছোঁবেন না, ডাক্তার! অ্যানাস্থেটিক্ না দিলে কিছুতেই ছুঁতে দেব না আমার পা।'

নিচু হয়ে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'আপনি ভাগ্যবান। রক্ত বন্ধ হয়ে আসছে। তার মানে মেইন আর্টারির কোনও ক্ষতি হয়নি। হলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতেন। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ আছে আপনার। একটু নড়াতে গেলেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। কিন্তু উপায় নেই।'

ডাইনিং রুমের দুই ডেক নিচে সিক্-বে। ওখানে পৌঁছবার আগেই জ্ঞান হারাল রানা দ্বিতীয়বারের জন্যে। কারণ, সিঁড়ির তিন চারটে ধাপ বাকি থাকতে ইচ্ছাকৃত ভাবে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল একজন বাহক—পড়েছিল রানাও। বোধহয় সিলভিয়া কিংবা সাব-মেশিনগানধারী ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

বারো

বিছানায় জ্ঞান ফিরল রানার।

রুস্তমের অন্যান্য কম্পার্টমেন্টের মতই প্রশস্ত এর সিক্-বে। আঠারো বাই পনেরো ফুট। চারটে সীট পাতা আছে হাসপাতালের মত করে। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথম দুটো সীটে শোয়ানো হয়েছে কমোডোর জুলফিকার আর ক্যাপ্টেন আনসারীকে। রানার মাথার পিছনে ডাক্তারের কন্সাল্টিং ডেস্ক। সামনে দুটো চেয়ার পাতা। ডেস্কের পাশ দিয়ে গেলে একটা ছোট্ট কুঠুরিতে ডিস্পেন্সারি। ছোট-খাট সার্জারীর জন্যে একটা কাউচ রাখা আছে একপাশে—প্রয়োজন মত উঠানো-নামানো যায় সেটাকে।

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছেন ক্যাপ্টেনের হাঁটু। তাঁর পাশেই নানা রকমের ইন্স্ট্রুমেন্ট, স্পঞ্জ, সিরিঞ্জ আর কয়েকটা শিশি-বোতল রাখা একটা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে যোরা হাসান। একটু আশ্চর্য হলো রানা ওকে এখানে দেখে, কিন্তু বলল না কিছুই। হঠাৎ চোখ পড়ল রানার, দরজার কাছেই ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে আছে অল্প বয়সী এক প্রহরী। কয়েকদিন না কামানোর ফলে সারা মুখে গিজগিজে দাড়ি-গোঁফ। অপরিষ্কার ইস্তিরিহীন নীল শার্ট-প্যান্ট পরনে, গায়ে একটা হলুদ সোয়েটার। একহাতে অটোমেটিক কারবাইন ধরা, অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো এতগুলো সশস্ত্র লোক? মোট কতজন সশস্ত্র লোক আছে কে জানে। তিনজন আহত লোকের জন্যে যদি একজন প্রহরী ব্যয় করতে পেরে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই প্রচুর লোকবল আছে ইয়াকুবের।

'তুমি এখানে কি করছ, যোরা?' এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল রানা।

চমকে উঠল যোরা, ট্রের উপর রাখা যন্ত্রপাতিগুলো ঝনঝন করে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডাকু চাচা। উত্তর দিলেন তিনিই।

'হেলপার হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করেছি আমি ওকে। নার্সকে স্ত্রীলোক এবং তরুণী হলেই মানায়। মাত্র দু'জন এই শ্রেণীর যাত্রী আছে আমাদের। যোরা আর ব্যারিস্টারের স্ত্রী।'

'ব্যারিস্টারের স্ত্রীকে তো দেখছি না?'

'ছিল কিছুক্ষণ আগে। অজ্ঞান হয়ে পড়ায় যোরাকে আনতে হয়েছে।'

'বেশ, চমৎকার। ক্যাপ্টেনকে কেমন দেখলেন, ডাকু চাচা?'

'তোমার এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে না হে, ছোকরা। প্রচুর রক্ত-ক্ষয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছ তুমি। ক্যাপ্টেন বাঁচবে, চিন্তা আছে কমোডোরকে নিয়ে। ক্যাপ্টেনের প্যাটেলা— তোমরা যাকে নী-ক্যাপ বলো—টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, টেন্ডন স্লাইস্ড্, টিবিয়া ফ্র্যাকচার্ড্। জীবনে কখনও আর হাঁটু ভাঁজ করতে পারবে না বেচারা। মেটাল প্লেট দিতে হবে খুব সম্ভব। আর কাঁধের গুলিটা ফুটো হয়ে বেরিয়ে গেছে পেকটোরাল মাস্‌ল্ ছিঁড়ে। ওর জন্যে বিশেষ চিন্তা নেই। এবার তোমার পালা, রানা—শক্ত করে নাও মনটা।'

'ঠিক আছে,' বলেই চাইল রানা প্রহরীর দিকে। 'অ্যাই! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। ইয়াকুব কোথায়?'

'ইয়াকুব বে কোথায় আছেন সে খবর রাখা আমার দায়িত্ব নয়,' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল প্রহরী।

অর্থাৎ, রানা বুঝল, ইংরেজি জানে লোকটা। ডাকু চাচাকে কাঁচি নিয়ে এগোতে দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে এল ওর। দেরি করাবার জন্যে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আর কমোডোর? ওঁর কি অবস্থা?'

'সেটা ঠিক করে বলতে পারছি না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। একটা গুলি ডান দিকের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে ঢুকে গেছে লাংসের মধ্যে। বুলেটটা রয়ে গেছে দেহের মধ্যে শোলডার ব্লেডের কাছাকাছি কোথাও। মেজর অপারেশনের দরকার, এখানে সেটা সম্ভব নয়। ভাবছি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের ক'টা দিন টিকে যাবেন কিনা। যেতে পারেন। ঘোড়ার মত শক্তিশালী ভদ্রলোক, এ রকম লোক সাধারণত টিকেই যায়। ফার্স্ট ওয়ার্লড ওয়ারে গুলি খাওয়া লোক এখনও আছে, দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে বুকের ভেতর বুলেট নিয়ে। ওঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু আর কথা নয়।' এগোলেন ডাকু চাচা।

'একটু পানি খাওয়াবেন?' কাতর কণ্ঠে বলল রানা।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' এক গ্লাস পানি এনে দিলেন তিনি রানার হাতে।

খাওয়া শেষ হতেই বললেন, 'একটু ভাল বোধ করছ এখন?

'ধন্যবাদ,' আবছা গলায় বলল রানা। আরও কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কেবল, কথা বেরোল না। ভয় পেয়ে কাছে সরে এলেন ডাক্তার। মুখের কাছে কান এনে শুনবার চেষ্টা করলেন তিনি রানার কথাগুলো।

নিচু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বলল রানা, 'আমার উরুর হাড় ভাঙেনি, কিন্তু এমন ভান করবেন যেন ভেঙে গেছে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল ডাক্তারের চোখে। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিলেন। মাথাটা সামান্য একটু ঝোঁকালেন সামনের দিকে। বললেন, 'রেডি?'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। মাত্র একটা বুলেট ছিল ভিতরে, বাকি দুটো সামান্য কিছু মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেগুলো থেকেই রক্ত পড়েছে বেশি। যতখানি দেখাচ্ছে তার দশ ভাগের এক ভাগও ক্ষতি হয়নি রানার। বুলেটটা বের করে ফেলা হলো। কাজ করতে করতে রানিং কমেন্ট্রি চালালেন ডাকু চাচা। নানান রকম বিস্ময়-ধ্বনি আর অঙ্গ-ভঙ্গি করে তিনি গার্ডটাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা রানার পায়ের। উনি যে অনর্গল মিছে কথা বলছেন সেকথা রানার জানা না থাকলে এই কমেন্ট্রি শুনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলত সে। কাজ শেষ করে গোটা কয়েক স্প্লিন্ট বেঁধে দিলেন তিনি রানার পায়ে। তারপর কয়েকটা বালিশ জড়ো করে তার উপর রাখলেন পা-টা।

ডাকু চাচা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঘরে ঢুকল কোহেন। প্রত্যেককে দেখল সে পরীক্ষা করে। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বোধ করছ এখন, বীরপুরুষ?'

'ইয়াকুব কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে। আমি এখন ইনচার্জ। কাল থেকে ইয়াকুব বে হবে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন। ভাল কথা, তোমার বন্ধু ঠিক কোর্সই বাতলে দিয়েছিল। এথেন্স ছাড়িয়ে চলেছি আমরা দক্ষিণে।'

'আমার পরামর্শেই ঠিক পথ বাতলেছে, নইলে এতক্ষণে হাঙ্গরের পেটে যেতে হত কোন দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে।'

মৃদু হাসল কোহেন। ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছে এরা?'

'কেমন থাকবে আবার? একদল গুণ্ডা মিলে গুলি ছুঁড়ে সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করে দিলে লোকে কেমন থাকে?' তিক্তকণ্ঠে বললেন ডাকু চাচা। 'কমোডোর জুলফিকার বাঁচতেও পারেন মরতেও প্যারেন। আমার কিছুই করবার নেই।

ক্যাপ্টেন আনসারী বাঁচবে—কিন্তু খোঁড়া হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। মাসুদ রানার ফিমা—অর্থাৎ থাই বোনে কম্পাউন্ড ফ্র্যাক্চার। বিধ্বস্ত হয়ে গেছে একেবারে। দুইদিনের মধ্যে তাকে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করতে না পারলে এ-ও খোঁড়া হয়ে যাবে জন্মের মত। এবার খুশি হয়েছ তোমরা?'

'আমি আন্তরিক দুঃখিত। কাউকে পঙ্গু করে বাঁচিয়ে রাখার চাইতে আমি একেবারে মেরে ফেলারই পক্ষপাতী। পঙ্গুর দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি না।'

'আহা-হা! বড় নরম তোমার মন!' টিটকারি মারল রানা।

'আমরা অমানুষ নই।'

'সেটা তো প্রমাণই করে দিয়েছ,' রানা চাইল কোহেনের চোখের দিকে। 'কিছুটা ভদ্রতা তো এখনও করতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'কি রকম?'

'ওই যে লোকটা বসে বসে রেল এঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছে অনর্গল—ওর সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে পারবে?'

'অসম্ভব। সিগারেট ছাড়া মরে যাবে ও। কিন্তু কেন?'

'ডাক্তারের কথা শুনেছ তুমি। কমোডোরের ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা! বুঝতে পেরেছি। আপনার কি মতামত, ডাক্তার?'

চতুর ডাক্তার বুঝে নিয়েছেন রানার মতলব। বললেন, 'ধোঁয়ার চেয়ে বড় আর কোনও শত্রু নেই ফুটো হয়ে যাওয়া লাংসের।'

'ঠিক আছে। তুমি চেয়ারটা নিয়ে বাইরে বসে পাহারা দাও,' ছোকরা গার্ড বেরিয়ে যেতেই রানার দিকে চেয়ে বলল কোহেন, 'কিন্তু কোনও রকম কৌশল করতে চেষ্টা করলে নিজেরাই বিপদে পড়বে। তাছাড়া করবেই বা কি? ওই জানালা দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো হয়তো—কিন্তু সে ক্ষমতাও তোমাদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু স্মরণ রেখো, সর্বক্ষণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে বাইরের প্রহরী।'

রানা পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল, আবার কথা বলে উঠল কোহেন।

'আমাকে কোনও প্রশ্ন করছ না দেখে সন্দেহ হচ্ছে আমার। কিছুই কি জানতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'কি জানতে ইচ্ছে করবে আবার? কি আছে জানবার?' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। বুঝল আজ জয়ের আনন্দে কথা বলবার মুডে আছে কোহেন। 'কয়জন সশস্ত্র গুণ্ডা আছে তোমাদের এই জাহাজে?'

'পঁয়তাল্লিশ জন। নেহায়েত কম না, তাই না? আটচল্লিশ ছিল, কমোডোর জুলফিকার একজনকে খুন করেছে, আর দুইজন মারা গেছে তোমার গুলিতে। তোমার হাতের টিপ তো বড় চমৎকার, মাসুদ রানা!'

'ওটা হঠাৎ হয়ে গেছে। পাপাগোসের জ্ঞান ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।' পাপাগোসের সম্বন্ধে কথা বলা পছন্দ হলো না কোহেনের।

'ফার্স্ট অফিসার এহ্সানকে ও-ই খুন করেছিল?'

'না। নার্স সিলভিয়া—খাবার টেবিলে যাকে মারলে তুমি আজ।'

'পাপাগোস, ইয়াকুব না তুমি—কার মাথায় এসেছিল বাক্সের ভেতরে করে সশস্ত্র গুণ্ডা তুলবার কথা?'

'ইয়াকুবের। এখন বুঝতে পারছি জানবার আগ্রহ তোমার এত কম কেন। সবই জানো তুমি।'

'জেনেছি—কিন্তু দেরিতে। মিনিট দশেক আগে চিন্তা করে বের করেছি। একেকটা বাক্সে কয়জন করে ছিল?'

'চব্বিশ জন। বেচারারা চব্বিশটা ঘণ্টা বড় কষ্ট পেয়েছে।'

'তাহলে দুটোর মধ্যে লোক ছিল। বাকি দুটোয়?'

'মেশিনারী।'

'একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কি জিনিস?'

'এই সমস্ত ব্যাপারের পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি? এত ঝুঁকি, এত পরিশ্রম! এতসব কিসের জন্যে?'

'সব কথা বলবার ক্ষমতা নেই আমার। না হে, জমল না তোমার সঙ্গে—বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে বসছ তুমি।' যোরার দিকে ফিরে বলল, 'কি গো, সুন্দরী? এখানেই থাকবে, না গল্প করবে আমার সাথে গিয়ে কিছুক্ষণ?'

কোনও উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল যোরা। বেরিয়ে গেল কোহেন। দরজা বন্ধ হতেই যোরা বলল, 'তুমি জানলে কি করে কিভাবে এসেছে ওরা জাহাজে?'

'এটা তো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। দুইয়ে দুইয়ে চার। কিন্তু এর পেছনে যে বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে, যে ভয়ঙ্কর ব্যাপারের জন্যে এতদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে এরা, তার কিছুই বুঝতে পারছি না। কিচ্ছু না। অথচ বের করতেই হবে। সময় থাকতে করতেই হবে কিছু না কিছু ব্যবস্থা। ডাকু চাচা, চা বা কফির ব্যবস্থা আছে আপনার এখানে?'

'আছে। কেন?'

'কফি খাব। যোরা একটু কষ্ট করবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'বানাতে জানো তো? কোটিপতির কন্যা...'

'তুমি চুপ করবে? দেখোই না পারি কিনা।'

পাঁচ মিনিট পর তিন কাপ কফি নিয়ে ডিস্পেন্সারীর দরজা দিয়ে ঢুকল যোরা হাসান। ট্রে-র দিকে চেয়ে রানা বলল, 'মাত্র তিন কাপ কেন? চারটে দরকার যে!'

'চারটে?'

'হ্যাঁ, চারটে। আমাদের তিন কাপ আর বাইরের প্রহরীর জন্যে এক কাপ।'

'কি যা-তা বলছ? পাগল হয়েছ তুমি?'

'এখনও হইনি।'

'মাথা খারাপ তোমার! ওই বদমাইশের জন্যে কফি বানাতে যাব কেন আমি? কিছুতেই…'

'রানার নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে, যোরা।' হঠাৎ সমর্থন করলেন রানাকে ডাকু চাচা। 'ও যা বলছে, তাই কর্।'

অবাক হয়ে চাইল যোরা ডাকু চাচার দিকে। তারপর আরেক কাপ কফি ঢেলে দিয়ে এল বাইরের প্রহরীকে।

'নিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সব ক'টা দাঁত বের করে।'

নিজের কাপ শেষ করে শুয়ে পড়ল রানা। কেমন লাগল কফিটুকু জানতে চাইল যোরা। রানা প্রশংসা করতেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাকু চাচার দিকে চেয়ে হাসল একটু।

'কি ব্যাপার, হাসছ যে?'

উত্তর দিলেন ডাকু চাচা। 'তোমার কফির মধ্যে শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কফির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মেশালে টের পাওয়া যায় না—তাই না?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন ডাকু চাচা রানার দিকে। রানা বুঝল কি পরিমাণ ধুরন্ধর এই আপনভোলা বৃদ্ধ। এক নিমেষে রানার মতলব টের পেয়ে গেছেন তিনি।

দুটো ঘটনাবিহীন দিন কেটে গেল।

ইয়াকুব বে জাহাজ দখল করে নেয়ার তৃতীয় দিন বেলা দশটায় ঘুম ভাঙল রানার। অস্বাভাবিক দোলা অনুভব করল সে। স্ট্যাবিলাইজার থাকা সত্ত্বেও দুলছে গোটা জাহাজটা। মাথা তুলে ডাক্তারকে ডাকতে যাচ্ছিল রানা। চোখ পড়ল ইয়াকুবের ওপর। সেইসাথে কানে গেল প্রচণ্ড হাতুড়ির আওয়াজ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছে ইয়াকুবকে দেখতে। দাড়ি গোঁফ কামানো।

ডান হাতটা গলায় জড়ানো একটা স্লিং-এর ওপর রাখা। বগলে চেপে ধরে আছে সে দুটো মোড়ানো চার্ট। মৃদু হাসল ইয়াকুব বে। ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন বিছানার পাশে। ডেস্কের ওপাশে বসে ক্লান্ত চোখে চাইল যোরা।

'কমোডোর আর ক্যাপ্টেন কেমন আছে, ডাকু চাচা?'

'কমোডোরকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রেখেছি। যত ঘুমাতে পারেন ততই ওঁর পক্ষে মঙ্গল। আর ক্যাপ্টেন কেমন আছেন উনিই বলতে পারবেন। সকালেই জ্ঞান ফিরেছে ওঁর।'

'আমি কেমন আছি নিজেই জানি না,' বললেন ক্যাপ্টেন আনসারী। 'শরীরের কোথাও কোনও ব্যথা মালুম পাচ্ছি না। খুব সম্ভব ওষুধের গুণে।'

'তুমি কি চাও, ইয়াকুব বে?' জিজ্ঞেস করল রানা এবার ইয়াকুবকে।

'ক্যাপ্টেন আপনার অনুমতি ছাড়া সহযোগিতা করতে রাজি নন। আমার কিছু নেভিগেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার। আপনি অনুমতি দিলেই…'

'আমি অনুমতি দিচ্ছি।'

'কি বললে?' বড় বড় হয়ে গেল যোরার চোখ। 'এই হীন দস্যুটাকে সাহায্য করবে তুমি?'

'আমার বক্তব্য তুমি শুনেছ। কি আশা করেছিলে তুমি আমার কাছ থেকে? নায়কোচিত বীরত্ব?' মৃদু হেসে নিজের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'চেয়ে দ্যাখো, হিরোইজম্ কোথায় টেনে এনেছে আমাকে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, রানা! তুমি…তুমি এই পাপিষ্ঠকে সাহায্য করতে যাচ্ছ?'

'সাহায্য না করলে অত্যাচারটা তোমার ওপর দিয়েও শুরু হতে পারে। কল্পনা করো, একটা একটা করে তোমার হাতের আঙুলগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে মট্‌কে। যে ভাবেই হোক না কেন, সাহায্য করতে বাধ্য করবে ও। তখন?'

'আমি ওকে ভয় পাই না,' বলল যোরা ভয়ে ভয়ে।

'এখন থেকে ভয় করতে শেখো। ভয়ঙ্কর লোক ও। যাক্‌গে, বলো, ইয়াকুব, কি বলবে?'

ক্যাপ্টেন আনসারীর বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইয়াকুব। একটা চার্ট খুলে ধরল ওর সামনে। 'সিয়েরা লিওন থেকে ইংল্যান্ডগামী কোনও জাহাজের কি কোর্স হবে আপনি বলতে পারবেন?'

'অক্লেশে।' মুখে মুখেই বলে দিলেন ক্যাপ্টেন আনসারী।

'চমৎকার!' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ইয়াকুবের মুখ। 'আপনার কোর্সের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে আমারটা।'

'তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কেন?'

'নিজের হিসেবটা একটু মিলিয়ে দেখলাম। আপনারটাও। যাক, সেই জাহাজটা যদি পনেরো ডিগ্রী ওয়েস্ট, অর্থাৎ আফ্রিকার ডাকার পোর্ট থেকে আজ সন্ধে ছ'টায় ছেড়ে সোজা নন্ স্টপ্ ইংল্যান্ডের দিকে রওনা হয়, আর আমি যদি এই জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগরে আগামী রোববার সকালে ওটার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তাহলে ঠিক কোন্খানটায় দেখা হবে আমাদের?'

'কত স্পীডে চলছে ওটা?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'ওহ্-হো, সেটাই বলা হয়নি! ফিফটিন নট্স্,' লজ্জিত হলো ইয়াকুব।

'রানা, ঠিক উত্তরটা দেব?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন বাংলায়।

'তাছাড়া উপায় নেই,' জবাব দিল রানা ইংরেজিতে।

'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল ইয়াকুব রানার উদ্দেশে। ভাষা আলাদা হলেও উত্তরটা শুনেই প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হয়নি ওর।

'যদি পনেরো নট্ হয় তাহলে ইন্টারসেপশন পয়েন্ট হবে ঠিক এইখানটায়।' দাগ দিলেন ক্যাপ্টেন চার্টের উপর।

'ঠিক বলেছেন!' নিজের চার্টটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল ইয়াকুব বে। 'হুবহু মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমাদের পজিশন যদি ৫.১৫ ঈস্ট আর ৩৭.৩৫ নর্থ হয় তাহলে এইটিন নট্সে ওই ইন্টারসেপশন পয়েন্টে পৌছতে আমাদের কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'টপ্ স্পীডে?' অবাক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'নিশ্চয়ই। হাতে সময় নেই দেখতেই পাচ্ছেন।'

'টপ্ স্পীডে চললে চুরমার হয়ে যাবে রুস্তমের স্ট্যাবিলাইজার। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে জাহাজ।'

'কি বলছেন আপনি?' উদ্বেগের ছায়া পড়ল ইয়াকুবের মুখের ওপর।

'বলছি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন আপনি, মিস্টার ইয়াকুব। সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না আমি, কিন্তু পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি দোলাটা। লম্বা গভীর একটা দোলা। এর মানে সামনে আসছে ট্রপিকাল স্টর্ম। পশ্চিম থেকে আসছে দোলাটা। অর্থাৎ দ্রুত এগিয়ে চলেছি আমরা হারিকেনের দিকে। হয়তো তিন-চারশো মাইল দূরে আছে এখনও, কিন্তু আছে। বুঝতে পেরেছেন? ওয়েদার রিপোর্ট শুনুন গিয়ে, তাহলে আর আত্মহত্যা করার ইচ্ছে থাকবে না।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি টপ্ স্পীডে কতক্ষণ লাগবে,' এতগুলো কথা গায়ে মাখতে চাইল না ইয়াকুব। যেন বিরাট কোনও লাভের তুলনায় এই

ঝুঁকিটা নিতান্তই সামান্য।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

'ওদের লাগছে কত?'

'বেয়াল্লিশ ঘণ্টা।'

'তার মানে ছয় ঘণ্টা পিছিয়ে যাচ্ছি?'

'মনে হয় না। কিছুই বলা যায় না এখন। আমার তো মনে হয় পৌঁছতেই পারবেন না। যদি পারেন তাহলে হয়তো দেখবেন কয়েক ঘণ্টা আগেই পৌঁছেছেন। কারণ সবাই তো আপনার মত উন্মাদ নয়। যে জাহাজকে ইন্টারসেপট্ করতে চাইছেন, সে জাহাজ আবহাওয়ার অবস্থা দেখে স্পীড কমিয়ে ফেলবে দশে।'

'কোর্সটা কি হবে আমাদের?' আশার আলো জ্বলে উঠল ইয়াকুবের চোখে।

অঙ্ক কষে কোর্স বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন আনসারী। তিক্ত কণ্ঠে যোগ করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনারটার সাথে মিলে যাচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন। হুবহু।' এগিয়ে গেল সে ডাক্তারের ডেস্কের কাছে। টেলিফোন তুলে নিয়ে ব্রিজকে আদেশ দিল টপ্ স্পীড দিতে। ওয়েদার রিপোর্ট শুনবার জন্যেও আদেশ দিল। সাবধান করে দিল যেন আদেশের অন্যথা না হয়।

'তাহলে টপ্ স্পীডের ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে, তাই না, ইয়াকুব?' এতক্ষণে কথা বলল রানা।

ফিরে এল ইয়াকুব রানার বিছানার পাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'নইলে বহু টাকার হীরা হাতছাড়া হয়ে যাবে তোমার। যে জাহাজকে আক্রমণ করতে যাচ্ছ, সেটা হীরা নিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। তাই না?'

এইবার সত্যিই চমকে উঠল ইয়াকুব। চমকে উঠল যোরা ও ডাকু চাচা—বোধহয় ক্যাপ্টেন আনসারীও। বলে কি রানা!

'কে বলেছে তোমাকে?' ফ্যাসফেঁসে অস্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল ইয়াকুব।

'কে আবার বলবে? বললে আজ এই অবস্থা হত না আমার।' পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছি—কিন্তু অনেক দেরিতে। ওগুলো কি ফিট করা হচ্ছে জাহাজে? কামান?'

'আপনাকে দ্বিতীয়বার আমি আমার দলে যোগদান করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার যোগ্য সম্মান দেয়া হবে

আমাদের দলে এলে। অবশ্য জানি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। সম্ভব হলে আপনার সরকার মাফিয়ার পেছনে লাগবার জন্যে আপনাকে বেছে নিত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন আপনারা মাফিয়ার কাছে।'

'কত টাকার হীরা যাচ্ছে ওই জাহাজে?'

'চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ড।'

'অর্থাৎ বাহান্ন কোটি টাকা!' হিসেব করে বলল রানা।

'এজন্যে কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছে আমাদের অনেক।'

'কিন্তু এম. ভি. রুস্তমের ওপর ভর করলে কেন তোমরা?'

'এটাই আমাদের কাজের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে। এই জাহাজের সামনে-পেছনে কামান ফিট করবার জন্যে রিইনফোর্সড ডেক আছে, তাছাড়া ঠিক সময় মত তৈরিও হয়ে গেল একটু চাপ দিতেই।'

'কিন্তু তুমি কি মনে করেছ ওয়্যারলেস সেট ভেঙে ফেললেই সব বিপদ চুকে গেল? দুনিয়ার কেউ টের পাবে না তোমার অপকীর্তি? জিব্রাল্টার পেরোবার আগেই…'

'মোটেও না। যে মুহূর্তে জাহাজ আমার দখলে এসেছে সেই মুহূর্ত থেকে স্বাভাবিক সন্তোষজনক সংবাদ ট্র্যান্সমিশন আরম্ভ হয়ে গেছে আমাদের নিজস্ব ট্র্যান্সমিটার থেকে। ওসব নিয়ে মিছে মাথা ঘামাবেন না—আমরা অ্যামেচার নই, রীতিমত প্রফেশনাল।'

'কিন্তু সহজ একটা জিনিস এড়িয়ে গেছে তোমার চোখ। ডেকে কামান ফিট করতে হলে তলা থেকে অ্যাঙ্গেল আয়রন দিয়ে খুঁটি শক্ত করতে হয়। চার পাঁচ দিনের কাজ। কিন্তু সেসব ছাড়া তিন ইঞ্চির চেয়ে বড় কামান থেকে দুটোর বেশি গোলা ছুঁড়তে পারবে না। প্লেটগুলো মুচড়ে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়বে।'

'দুটোর বেশি গোলা ছোঁড়ার প্রয়োজনই হবে না আমাদের।' হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, এখন আসি। আবার দেখা হবে। সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।'

ইয়াকুব বেরিয়ে যেতেই ছেঁকে ধরল রানাকে যোরা ও ডাকু চাচা।

'সত্যিই ও কামান বসাচ্ছে নাকি জাহাজে?' জিজ্ঞেস করল যোরা।

'হ্যাঁ। দুটো বাক্সের মধ্যে করে কামান উঠেছিল জাহাজে। ইশ্‌শ্‌, ঘুমিয়ে ছিলাম আমি এতদিন। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'কিন্তু, কিন্তু…খোলা সমুদ্রের ওপর ডাকাতি…আজকের দিনে…

অসম্ভব!'

'ইয়াকুবের পক্ষে সবই সম্ভব। সমস্ত কিছু প্ল্যান করা আছে ওর। কেউ ঠেকাতে পারবে না ওকে।'

হতবাক হয়ে গেল ঘরের সবাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার তাৎপর্য রানার মত করে উপলব্ধি করতে পারল না আর কেউ। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে তার। কৌশলে অনেক কথা বলিয়েছে সে ইয়াকুবকে দিয়ে। রীতিমত ভয় পেয়েছে রানা। এমন ভয় জীবনে খুব কমই পেয়েছে সে।

নাস্তার পালা সেরেই চলে গেছে যোরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে। ডাকু চাচার কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ চেয়ে নিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে রানা। ভীতির নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে চায় সে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো ওর।

তেরো

ঘুম ভাঙল রানার বিকেলে। সন্ধ্যার দেরি আছে এখনও, কিন্তু আঁধার হয়ে গেছে চারদিক। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখতে পেল রানা বাঁকা বৃষ্টির ধারা। অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি কাত হয়ে। সেই সাথে কানে এল বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ। শিসের মত শোনা যাচ্ছে শব্দটা, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গোঙানি। রানা বুঝল ঠিকই বলেছেন ক্যাপ্টেন আনসারী। ঝড়ের মুখে পড়েছে ওদের জাহাজ। প্রকাণ্ড উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে জাহাজ। এই সবে শুরু। অনেক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

'এখন কেমন বোধ করছেন, ক্যাপ্টেন?'

'শারীরিকভাবে ভাল,' উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু যতই ভাবছি, ততই ভীতি আমার বেড়ে চলেছে, মেজর। লোকটা বদ্ধ পাগল।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক ধরনের ম্যানিয়াক— উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ভয়ঙ্করতম অসম্ভব কাজ করতেও দ্বিধা করে না এরা। কিন্তু ঠেকাবার কি কোনও উপায়ই নেই?'

'হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পিছিয়ে পড়বে।'

'প্রকৃতি ঠেকাতে পারবে না ওকে।' গাল ঘষল রানা কিছুক্ষণ। 'আমাকেই শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'আপনি! গুলি খাওয়া পা নিয়ে আপনি কি করবেন?' ছানাবড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের চোখ।

'এই পা নিয়েই বেরোতে হবে আমাকে। যে ভাবেই হোক। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'বেরিয়ে গিয়ে কি করবেন আপনি?'

পরিষ্কার বাংলায় ভেঙে বুঝিয়ে দিল রানা ওর প্ল্যান। ক্যাপ্টেন অনেক ভাবে চেষ্টা করলেন ওকে ঠেকাবার, প্রতিটা যুক্তিতে হেরে গিয়ে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন, এছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। গুঁড়ো হয়ে যাওয়া হাঁটু নিয়ে ওঁর পক্ষে কোনও সাহায্য করা সম্ভব নয়। কমোডোরের পক্ষে তো নয়ই। থেকে থেকে প্রলাপ বকছেন তিনি। এই অবস্থায় মাসুদ রানাকে একা ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায়ই বা কি? কিন্তু কী আশ্চর্য এই লোকটা! শুধু শুধুই সে অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক হয়েও ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ গ্র্যানিট-হার্টেড কমোডোর জুলফিকারের এতখানি প্রিয়পাত্র হয়নি। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ভাবলেন ক্যাপ্টেন, হয়তো তিনি দেশের সেরা কমান্ডো ফাইটার মাসুদ রানাকে আন্ডার-এস্টিমেট করে শুধু শুধুই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। পরমুহূর্তেই বুঝলেন, মিছেই উদ্বেগের উপর প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করছেন। পায়ে তিন তিনটে গুলি খেয়ে এতবড় একটা বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া অতি বড় কমান্ডো ফাইটারের পক্ষেও দুঃসাহসের কাজ।

যোরা এসে প্রবেশ করল। ছুটে এসে দাঁড়াল রানার বিছানার পাশে। রানার উল্টোদিকে একটা বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছেন ডাকু চাচা। মৃদু হাসল সে ওদিকে চেয়ে। ইয়াকুবকে সাহায্য করবার জন্যে ও যে রানার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল সে কথা ভুলেই গেছে।

'প্যাসেঞ্জারদের খবর কি, যোরা?'

'সব গড়াগড়ি খাচ্ছে আর বমি করছে।'

'একটা কাজ করতে পারবে?'

'কি কাজ?'

'তোমাদের কেবিনে যাবার পারমিশন নিয়ে ওখানে যাবে একবার সন্ধের আগে। ওদের বলবে, গত রাতে শীত লেগেছিল বলে কম্বল আনতে যাচ্ছ। তোমার আব্বার কালো ডিনার স্যুটটা কম্বলের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আসবে। তোমার যদি কালচে রঙের কোনও ড্রেস থাকে সেটাও নিয়ে আসবে। কিন্তু দেখো, ধরা পড়ে যেয়ো না যেন।'

'কিন্তু কেন? কালো ডিনার স্যুট...'

'পরে বলব সব কথা।'

'আগে বলো কি করবে তুমি···

কোহেন ঢুকল। বগলের তলায় চার্ট।

'একটা ছোট্ট ব্যাপারে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। এস এস সান্তা ক্রুজের সকাল আটটা, দুপুর বারোটা আর বিকেল চারটার কোর্স পজিশন পাওয়া গেছে। তোমার চামচা ওই ক্যাপ্টেনটাকে বলো অঙ্ক কষে দেখতে—ওর তৈরি কোর্সেই এখনও আছে কিনা সেটা।'

'সান্তা ক্রুজ মানে সেই হীরক-বাহী জাহাজটা?'

মাথা ঝাঁকাল কোহেন বিরক্ত ভঙ্গিতে।

'কিন্তু সেটার কোর্স পজিশন তোমরা জানলে কি করে? সান্তা ক্রুজ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে নিজের পজিশন জানাচ্ছে না? রেডিও অপারেটার···ওই জাহাজের রেডিও অপারেটার কি তাহলে···

'ইয়াকুব বে দূরদর্শী লোক। প্রতিভাবানও বলতে পারো। সান্তা ক্রুজের নিজস্ব দু'জন রেডিও অফিসার হঠাৎ মারাত্মক রকম অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের বদলে আমাদের দু'জন লোককে কাজে নেয়া হয়েছে সিয়েরা লিওনে। তাদের মধ্যে একজন আবার শুধু ওয়্যারলেস অপারেটারই নয়—অত্যন্ত এক্সপার্ট নেভিগেটার। কোর্স পজিশন ও-ই পাঠাচ্ছে।'

'এই ডাকাতির পর আমাদের নিয়ে কি করা হবে?' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমাদের সব সান্তা ক্রুজ-এ উঠিয়ে দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়া হবে।'

'যাতে পরমুহূর্তেই দুনিয়াময় খবর ছড়াতে পারি যে এম. ভি. রুস্তমে করে···' টিটকারি মারতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বাধা দিল কোহেন।

'শুধু দুনিয়াময় কেন, দুনিয়ার বাইরে খবর ছড়ালেও কিছু হবে না। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি পাগল ঠাউরেছ আমাদের? সেই সকালেই আমরা রুস্তমকে নিরুদ্দেশের পথে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব অন্য জাহাজে। ইন্টারসেপ্টিং পয়েন্ট থেকে চল্লিশ মাইলের ভেতর আমাদের জন্যে এখন থেকেই অপেক্ষা করছে একটা ইয়ট। সবদিক ভেবেই প্ল্যান তৈরি করেছে ইয়াকুব বে।'

চার্টটা হাত বাড়িয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন। কম্বল আনবার ছুতোয় চলে গেল যোরা কোহেনের সাথে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল ওরা। গম্ভীর ভাবে চার্টটা ফেরত দিলেন ক্যাপ্টেন কোহেনের হাতে। ঠিক কোর্স ধরেই এগোচ্ছে

সান্তা ক্রুজ। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল কোহেন। জাহাজ দখল করে নিয়ে বিনয়ের অবতার হয়ে গেছে সে। থেকে থেকেই হাসির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে ওর ভাবলেশহীন মুখে।

আটটার সময়ই ডিনার সেরে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল রানা।

ঠিক নয়টায় পাঁচ কাপ কফি তৈরি করল যোরা। এক এক করে এনে দিল রানা, ক্যাপ্টেন, আর ডাকু চাচাকে ব্যালে ডান্সারের মত জাহাজের দোলার সঙ্গে দেহটাকে ব্যালেন্স করতে করতে। ডেস্কের ওপর নিজের কাপটা রেখে সেন্ট্রির কাপটা নিয়ে গেল সে ডাকু চাচার কাছে। চায়ের চামচের এক চামচ পাউডার ঢেলে দিলেন ডাকু চাচা ওর মধ্যে। কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল যোরা। দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল।

'নিল?' উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নেবে না?' জবাব দিলেন ডাকু চাচাই। 'ও দিলে বিষও তো খাবে ছোকরা!'

'বেচারা নীল হয়ে গেছে বমি করতে করতে। কফিটুকু পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল,' বলল যোরা মৃদু হেসে।

'ঠিক কোনখানটায় আছে ও?'

'প্যাসেজে। মেঝেতে বসে আছে এক কোণে। মেশিনগান হাঁটুর ওপর রাখা।'

'ওষুধটা কাজ আরম্ভ করবে কখন, ডাকু চাচা?'

'খুব বেশি হলে বিশ মিনিট। অ্যাক্‌শন আধঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা থাকবে, যার যেমন স্বাস্থ্য সেই অনুযায়ী।'

'বেশ। এবার পায়ের স্‌প্লিন্টগুলো খুলে দিন।'

'এছাড়া আর কোনও উপায় নেই, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন ডাকু চাচা।

'না।'

স্‌প্লিন্টগুলো খুলে দিতেই বিছানা থেকে পা নামাল রানা। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। বাম পা-টা মাটিতে পড়তেই যেন এক ঝলক আগুনের হল্কা উঠল রানার ঊরু বেয়ে ওপর দিকে। খাটের পায়া ধরে উঠে পড়ল সে ডান পায়ে ভর দিয়ে। আবার চেষ্টা করল। নাহ্‌, বাম পা-টা ছোঁয়ানোই যাচ্ছে না মাটিতে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে যোরার মুখ। বার কয়েক চেষ্টা করে বসে পড়ল রানা একটা চেয়ারে। বাম পা মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার হয়ে আসছে রানার চোখ। বুঝল, এভাবে কয়েক

পা গেলেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে সে মাটিতে।

'বিছানায় চলো, রানা। শুধু শুধু পাগলামি কোরো না,' যোরা এসে হাত ধরল।

'ডাকু চাচা! একটা আইডিয়া এসেছে। মরফিয়া ইঞ্জেক্ট করে দিন। উরুর ব্যথা আর টের পাব না তাহলে।'

'ফুটবল প্লেয়ারদের কেউ কেউ মচকানো পায়ে ইন্‌জেকশন নিয়ে মাঠে নামে দেখেছি, সেই রকম?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাছা, তিনটে বুলেটের গর্ত নিয়ে কোনও ফুটবল প্লেয়ারই...'

'আমি তো ফুটবল খেলতে যাচ্ছি না। কোনমতে হাঁটতে পারলেই যথেষ্ট। দেরি করবেন না। শিগ্‌গির সিরিঞ্জ নিয়ে আসুন।'

'কিছুতেই দিয়ো না, ডাকু চাচা। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে ও!' ফুঁপিয়ে উঠল যোরা।

'ক্যাপ্টেন কি বলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'মেজর যা বলছেন তাই করুন,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন আনসারী।

'তা তো বলবেনই। আপনার তো আর যেতে হচ্ছে না...'

'যোরা!' রানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ চাবুক হানল যেন।

'ঠিক বলেছেন আপনি,' বিড় বিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন আনসারী। 'আমি সক্ষম হলেও বোধহয় এত বড় রিস্ক নিতে সাহস পেতাম না। কিন্তু আমি যেমন জানি, মেজর রানাও তেমনি জানেন, কিছু একটা করতে না পারলে রুস্তমের একটি প্রাণীরও বাঁচবার আশা নেই। আজ মেজর রানা মারা গেলে দু'দিন আগে যাবেন, এই যা তফাৎ। চেষ্টা করে মরা ভাল নয়?'

'আমাকে মাফ করবেন,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল যোরা।

হাইপোডারমিক এনে বেশ খানিকটা তরল পদার্থ ঢুকিয়ে দিলেন ডাকু চাচা রানার বাম পায়ে। বললেন, 'ব্যথা কমবে ঠিকই, কিন্তু এই পায়ের ওপর বেশি চাপ পড়লে চিরকালের মত খোঁড়া হয়ে যেতে পারো। কথাটা খেয়াল রেখো।'

হাসান খলীলের স্যুটটা পরে নিল রানা ডিস্‌পেন্সারিতে গিয়ে। চারকোনা করে ছিঁড়ে ফেলল যোরার কালো দামী ককটেল ড্রেসটা। এমনি সময়ে এসে ঢুকল যোরা। কাপড়টা ভাঁজ করে ত্রিভুজাকার বানিয়ে মুখটা বেধে নিতে যাচ্ছিল রানা।

'যাবেই তাহলে?' নিচু গলায় বলল যোরা।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাহলে আমার জন্যেও ছেঁড়ো একটুকরো কাপড়।'

'তোমার জন্যে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা যোরার দিকে।

'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি তোমার সাথে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে আরেক টুকরো কাপড় ছিঁড়ল রানা যোরার জন্যে। হাতে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে সেটাকে ত্রিভুজাকার বানাল যোরা।

মুখে বেঁধে নিল ওরা কালো কাপড়ের টুকরো। চোখ দেখা যাচ্ছে কেবল। বেরিয়ে এল এবার ডিস্‌পেন্সারি থেকে। অবাক হয়ে গেছে ডাকু চাচা।

'তুই আবার হুড পরেছিস কেন, মা?'

'আমিও যাচ্ছি যে।'

'যা। চোখ কান খোলা রাখিস।' সবাইকে অবাক করে দিয়ে সহজেই রাজি হয়ে গেলেন ডাকু চাচা। রানা বুঝল এই অভিযানের গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তিনি। 'এই টর্চটা সাথে নিয়ে যাও, রানা, কাজে লাগতে পারে।'

প্রথমে জুতোর গোড়ালিতে লুকানো একটা গোপন কুঠুরি থেকে ফোল্ডিং নাইফটা বের করল রানা। বিশেষ কায়দায় কয়েকটা ভাঁজ খুলতেই চার ইঞ্চি ব্লেডের একটা ক্ষুরধার স্টীলের ছুরি হয়ে গেল সেটা। টর্চটা পকেটে রেখে ছুরি হাতে এগোল রানা দরজার দিকে। বেরিয়ে পড়ল ওরা প্যাসেজে।

গভীর ঘুমে ঘুমাচ্ছে প্রহরীটা কোণে হেলান দিয়ে। হাঁটুর ওপর রাখা সাব-মেশিনগান। প্রলোভনটা সামলে নিল রানা। ঘুমন্ত প্রহরী ধরা পড়লে বড় জোর গোটা কতক লাথি আর গালাগালি খাবে। কিন্তু অস্ত্রহীন ঘুমন্ত প্রহরী দেখলে সমস্ত জাহাজে হুলস্থূল পড়ে যাবে।

তিন মিনিটে দুটো কম্‌প্যানিয়ন-ওয়ে পেরিয়ে পৌঁছে গেল ওরা 'এ' ডেকের কাছে। বাম পায়ে কোনও সাড়াই পাচ্ছে না রানা আর। তার ওপর একেকবার যে প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠছে জাহাজটা তাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়েছে। আর একশো মাইলও নেই হারিকেনের প্রাণ-কেন্দ্র। বিউফোর্ট স্কেল কাকে বলে জানে না রানা। ক্যাপ্টেন বলছিল হাওয়ার শক্তি এখন ফোর্স এইট বা নাইন। এর মানেও জানে না সে। কিন্তু তুফান যে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড বেগে ঢেউ এসে ধাক্কা খাচ্ছে জাহাজের গায়ে। মনে হচ্ছে ভেঙে চুরমার করে দেবে ওরা এই শক্তমত বেয়াড়া জিনিসটাকে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগোল রানা। চারদিক অন্ধকার। ডেকের প্রত্যেকটা বাতি নেভানো। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ইয়াকুব। রানার এতে সুবিধাই। পা টিপে এগোবার প্রয়োজন নেই—বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দে সব ঢাকা পড়েছে, তার ওপর আছে সমুদ্রের গর্জন। অল্পক্ষণেই রেডিও রুমের কাছে এসে পৌছল ওরা ড্রইংরুমের পাশ দিয়ে। দরজায় কান লাগিয়ে ভেতরে কোনও শব্দ শুনতে পেল না রানা। এক হাতে অন্য কান ঢাকল বাইরের শব্দ বন্ধ করবার জন্যে। নাহ্, তবু শোনা যাচ্ছে না কিছু। আস্তে নব ঘুরিয়ে ধাক্কা দিল সে দরজাটা। আধ ইঞ্চিও নড়ল না সেটা। রানা বুঝল ভেতর থেকে বন্ধ। অতি সাবধানে নব ছেড়ে সরে এল সে যোরাকে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল যোরা।

'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্থাৎ, গার্ড আছে ভেতরে।'

'অথচ ভেতরে ঢুকতে হবে তোমাকে। তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি ওই জানালার ধারে গিয়ে হুড খুলে ফেলে টোকা দেবে। হয় রেডিও রুমের লাইট জ্বালাবে, নয় টর্চ জ্বালাবে লোকটা। ও দেখবে মেয়েমানুষ, তখন ভয় পাবে না, আশ্চর্য হবে। বেরিয়ে আসবে কি ব্যাপার অনুসন্ধান করতে।'

'আর সেই সময় তুমি...তুমি...'

'হ্যাঁ। খুন করব আমি ওকে।'

'ওইটুকু একটা ছুরি দিয়ে? তুমি...'

'ওটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা আছে আমার। চলো।'

'তার আগে বলো, ভেতরে ঢুকে কি করবে তুমি?'

'ডিসট্রেস ফ্রিকোয়েন্সিতে এসওএস পাঠাব। সবাইকে জানিয়ে দেব রুস্তমের বর্তমান অবস্থা, ইয়াকুবের জবর-দখলের কথা, এবং সান্তা ক্রুজ আক্রমণের কথা। চারদিকে তৎপরতা আরম্ভ হয়ে যাবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে তৎপর হয়ে উঠবে ইয়াকুব বে। গার্ডটাকে কোথায় লুকাবে তুমি?'

'ভূমধ্যসাগরে।'

'সিক্ বে-র গার্ডকে ঘুমাতে দেখেই ইয়াকুব বুঝবে কাজটা কার। তোমার ব্যান্ডেজ খুলে দেখবে থাই-বোন ভাঙেনি। তখন? তখন কি অবস্থা হবে তোমার?'

'আমার যাই হোক, কিছু এসে যায় না তাতে।'

'আমার যায় আসে। দ্বিতীয় কথা, তুমি বলছ চারদিকে সবাই তৎপর হয়ে উঠবে। ইয়াকুবের নিযুক্ত সান্তা ক্রুজ-এর অপারেটাররাও জানতে পারবে। ওরা তৎক্ষণাৎ খবরটা জানাবে ইয়াকুবকে।'

'কাজ শেষ হয়ে গেলেই সেটটা নষ্ট করে দিয়ে আসব।' রানা বুঝল, হেরে যাচ্ছে সে যোরার অকাট্য যুক্তির কাছে।

'ওই একটাই রেডিও। রিসিভার আছে রুস্তমের তা মনে করছ কেন? আশেপাশের প্রত্যেকটা স্টেশন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অবিরাম ব্রডকাস্ট আরম্ভ করবে। ইয়াকুবের কাছে খবরটা পৌঁছবেই।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ক্যাপ্টেন আনসারী আর তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমরা স্থির নিশ্চিত যে প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জার এবং ক্রুকে খুন করবে ইয়াকুব। প্রমাণ বা সাক্ষ্য নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে। একটি প্রাণীও যদি বেঁচে থাকে তাহলে সাক্ষ্য দেবে ওর বিরুদ্ধে। নিরাপদে ইস্তাম্বুলে ফিরে নিজ অপকীর্তি চালু রাখতে হবে ওকে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কাজেই যেই মাত্র এসওএস-এর খবর ওর কানে যাবে, সেই মুহূর্তে ওর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নির্মূল করবে ও, তারপর সরে পড়বে এই জাহাজ ছেড়ে দিয়ে। তার মানে সব শেষ। এসওএস পাঠিয়ে কি লাভটা হলো তাহলে?'

চুপ করে রইল রানা। মাথাটা চলছে না ওর। ওর একটা হাত ধরল যোরা। চমকে উঠে বলল, 'উহ্, কি ঠাণ্ডা! শীতে কাঁপছ তুমি, রানা। চলো, কথা শোনো, লক্ষ্মী, ফিরে চলো সিক্ বে-তে।'

'সেটা হয় না। একটা কাজ বাকি আছে।'

'কোথায় চললে, রানা?'

পাপাগোসের কেবিনের দিকে। ওই লোকটাই এই সমস্ত অনর্থের মূল। খুব সম্ভব ওর হুকুমেই কাজ করছে ইয়াকুব। এই লোকটার সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না আমরা। গলার ওপর ছুরি ধরতে পারলে অনেক কথা বেরোবে এর কাছ থেকে। তাছাড়া একে বশে আনতে পারলে হয়তো জাহাজটাই বশে আনা যাবে। শেষ একটা চেষ্টা আমাকে করে দেখতেই হবে।'

'তুমি তো সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছ না!'

'সোজা করে রাখবার জন্যেই তো তোমাকে আনা হয়েছে। ইয়াকুবকে পাব না—ব্রিজের ওপর আছে ও। গার্ড ওখানে অনেক বেশি। এই পাপাগোসই এখন একমাত্র ভরসা।'

এগোল রানা। সাথে সাথে যোরাও। 'এ' ডেকে এসে উপস্থিত হলো

ওরা। পাপাগোসের কেবিন চিনে বের করতে এক মিনিটও লাগল না।

'সেন্ট্রাল প্যাসেজ-ওয়ে দিয়ে ঢুকব আমি এই ঘরে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখে এমন ভাব করব যেন পিস্তল আছে আমার পকেটে।'

'কিন্তু কাকে পিস্তলের ভয় দেখাবে তুমি? এই তো ওর কেবিনের জানালা—পাপাগোস এই ঘরে নেই। বাতি নেভানো।'

'হয়তো পর্দা টানা আছে।'

ঝিক্ করে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। রানা রওনা হতে যাচ্ছিল হাত ধরে টেনে রাখল যোরা। ফিসফিস করে বলল, 'পর্দা তো নেই! বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম পর্দা নেই জানালায়।'

কাউকে দেখলে?'

'ঘরের সবটা দেখতে পাইনি।'

কাঁচের জানালার গায়ে সেঁটে দেখবার চেষ্টা করল রানা ভেতরে। কিন্তু ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ঠিক এমনি সময় আবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ। নিজের চোখ দুটোর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল রানা জানালার কাঁচে। তাছাড়াও আরও একটা জিনিস দেখল রানা। প্রায় অস্ফুট একটা বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

'কি হলো?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল যোরা।

'চেয়ে দ্যাখো!' পকেট থেকে টর্চটা বের করে আলো ফেলল রানা ঘরের ভেতর।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পাপাগোস বিছানায়, জেগে আছে। দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। সাদা চুলের পরচুলাটা সরে গেছে কপাল থেকে বেশ অনেকখানি। লাল চুল দেখা যাচ্ছে ওর নিচে। চট্ করে কয়েকটা কথা খেলে গেল রানার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মত। কোথায় শুনেছে সে লাল চুলের কথা? পরিষ্কার ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়, ম্যাখারভের মরা মুখ। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা।

'পাপাগোস!' যোরার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'পাপাগোসের হাত-পা বাঁধা! এর মানে কি, রানা? হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে কেন ওকে ওরা?'

'আমি জানি,' ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ কণ্ঠ রানার। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে একবার। কেউ যেন হেঁটে চলে গেল ওর কবরের ওপর দিয়ে। অমানুষিক মানসিক বল প্রয়োগ করে নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করল আতঙ্কিত রানা। 'যোরা! সব বুঝতে পেরেছি আমি এবার। কিন্তু, খোদা! না বুঝলেই বোধহয় ভাল হত!'

হাত ধরে ডানধারে টেনে নিয়ে চলল রানা যোরাকে।

চোদ্দ

চার নম্বর হোল্ডের কাছে এখন ওরা। ক্যানভাস আর গোটা কয়েক কাঠের ঢাকনি সরিয়ে নিচের দিকে চাইল রানা। ঘোর অন্ধকার। স্টোর থেকে চুরি করে আনা স্ক্রু ড্রাইভারটা যোরার হাতে দিল সে।

'আমি আলো জ্বালাচ্ছি, সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ো তুমি গর্তের মধ্যে।'

যোরার মাথাটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই রানাও নামতে আরম্ভ করল। বুক সমান নেমে ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দিল সে গর্তমুখ। তারপর টর্চ ফেলল নিচের দিকে। হুলস্থূল কাণ্ড চলেছে নিচে। সমুদ্রের প্রলয় মাতনে দুলছে জাহাজ, সেই সাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে গোটা কতক প্রকাণ্ড এবং ভারি বাক্স। ওগুলোর একটার তলায় পড়লেই ব্যাঙ-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে ওরা।

'কফিন কোথায়?' নিচে নেমেই জিজ্ঞেস করল যোরা।

'ওই যে!' আলো ফেলল রানা কফিন দুটোর ওপর। সিঁড়ির নিচেই একপাশে সযত্নে রাখা। জাহাজের দোলায় যাতে গড়াগড়ি খেতে না পারে সেজন্যে শক্ত করে বেঁধেছে ইয়াকুব ওগুলোকে দুটো খুঁটির সঙ্গে। এগিয়ে গেল রানা ওগুলোর দিকে।

টর্চ ধরল যোরা। স্ক্রু ড্রাইভারটা নিয়ে কাজে লেগে গেল রানা। সেন্ট্রিটা এতক্ষণে জেগে গেল কিনা কে জানে! জলদি কাজ সারতে হবে।

ঢাকনিটা খুলতেই একটা কম্বল দেখতে পাওয়া গেল। কম্বল সরিয়েই বুঝল রানা, ঠিকই সন্দেহ করেছিল সে। মৃতদেহটা অ্যামাটলের। প্রাইমার, ডিটোনেটার—পরিষ্কার চিনতে পারল সে। একটা ছোট্ট চৌকোণা বাক্সের মধ্যে থেকে তার বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা। বুঝল, টাইমিং ডিভাইস ওটা।

'কি ওগুলো?' রানার ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে দেখছে যোরা।

'অ্যামাটল্।'

'অ্যামাটল্ কি?'

'এক্সপ্লোসিভ। রুস্তমকে উড়িয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কফিনের মধ্যে এগুলো কেন?'

কম্বলটা আবার জায়গা মত রেখে স্ক্রুগুলো লাগাতে লাগাতে বলল রানা, 'সব বলব তোমাকে পরে।'

দ্বিতীয় কফিনের ডালাটা খুলে ফেলল রানা এবার। সাবধানে উপরের কম্বলটা সরিয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল ওর। ছয় ফুট লম্বা, বারো ইঞ্চি ডায়ামিটার— অ্যালুমিনিয়ামের জিনিসটা—পাইরোসেরাম নোজ ক্যাপ লাগানো।

জিনিসটা দেখা মাত্রই একটা অশুভ অশরীরী প্রেতাত্মা যেন ভর করল রানার ওপর। নিজের অজান্তেই বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ।

'কি এটা?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল যোরা। 'রানা! কি এই জিনিসটা?' কেঁপে উঠল যোরার কণ্ঠস্বর। 'বলো? চুপ করে রইলে কেন?'

'লেনিন M-315!' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা।

'কি বললে? ভার্না থেকে যে চুরি গিয়েছিল, সেই রাশান অ্যাটম বোমা? ইয়াকুব কি করবে এটা দিয়ে? ডাকাতির পর রুস্তমকে ছেড়ে দিয়ে যখন ওর ইয়টে চলে যাবে, তখন ধ্বংস করে দেবে রুস্তমকে?'

'না। এই সব ছেলেমানুষি বুদ্ধি ওর মাথায় নেই। আসলে কোনও ইয়টই ওর জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আসলে ডাকাতির পর দয়ালু ইয়াকুব আমাদের সবাইকে তুলে দেবে সান্তা ক্রুজে। তারপর আরও খানিকটা দয়া দেখিয়ে সে সান্তা ক্রুজের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করবে, মৃতদেহগুলো প্লেনে করে এথেন্সে পাঠিয়ে দেবার জন্যে সে যেন লিস্‌বনে নামিয়ে দেয়। কোনও জাহাজের কোনও ক্যাপ্টেনই এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবে না—উপেক্ষা করলে কফিন দুটো জাহাজে তুলতে বাধ্য করবে ইয়াকুব। টাইম সেট করা থাকবে দুটো বোমাতেই। অল্পক্ষণেই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সান্তা ক্রুজ—আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স কিচ্ছু করতে পারবে না। কোনও প্রমাণ থাকবে না ওর বিরুদ্ধে।'

'লোকটা মানুষ না পিশাচ!'

'পিশাচ। এই জন্যেই সে চুরি করেছে বোমাটা এবং নিকোলাই সেরভকে। সে চায় টোটাল ডেস্ট্রাক্‌শন্। একটি প্রাণীও যেন না বাঁচে। একমাত্র অ্যাটমিক এক্সপ্লোশনেই সেটা সম্ভব।'

যত্নের সঙ্গে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল রানা লেনিন M-315—তারপর ঢাকনিটা বসিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল।

'এইবার বুঝেছি আমি!' অস্বাভাবিক শোনাল যোরার কণ্ঠস্বর।

'পাপাগোসই আসলে ডক্টর নিকোলাই সেরভ!'

'হ্যাঁ! ওকে ইয়াকুবের অত্যন্ত দরকার। ওকে ছাড়া লেনিন M-315-এর কোন মূল্যই নেই ওর কাছে। সে ছাড়া এটাকে ফাটাবার কৌশল আর কেউ জানে না। কাজেই আনতে হয়েছে ওকে ছদ্মবেশে। বেচারা লালচুলো সেরভ। প্রাণের ভয়ে আসতে হয়েছে তাকে, সর্বক্ষণ কঠিন প্রহরার মধ্যে রেখেছে তাকে ছদ্মবেশী নার্স সিল্‌ভিয়া পিস্তলের ভয় দেখিয়ে। একমাত্র আমরাই সাহায্য করতে পারতাম— আমাদের হাতেও মার খেয়েছে বেচারা।'

উঠে দাঁড়াল রানা। ছোট্ট টর্চটা যোরার হাত থেকে নিয়ে নিভিয়ে রেখে দিল পকেটে। 'কিন্তু সিক্ বে-তে গিয়ে এইসব কথা যেন বোলো না তুমি আবার। ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকেন কমোডোর—টের পেয়ে যেতে পারে ইয়াকুব ওঁর দু'একটা টুকরো কথায়। তাহলে আর রক্ষা পাওয়ার কোন পথ থাকবে না। একদম হজম করে ফেলো কথাটা। কাউকে একটি কথাও বলবে না। তোমার আব্বাকেও না। চলো এখন।'

'ওই জিনিসটাকে তুলে সমুদ্রে ফেলে দিলে হয় না?'

'কিভাবে? আড়াইশো পাউন্ড ওজন ওটার। এই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠাই যাবে না ওটা নিয়ে। যদি যেতও, এখন কিছুই করা ঠিক হবে না। যেইমাত্র ইয়াকুব জানতে পারবে যে খোয়া গেছে বোমাটা—কাজটা যে-ই করুক কিছু এসে যায় না—ও বুঝবে রুস্তমের প্রত্যেকটা লোককে নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিহ্ন করবার উপায় হিসেবে শুধু অ্যামাটলের ওপর নির্ভর করা যায় না। তাহলে কি করবে ও? রুস্তমের প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জার এবং প্রত্যেকটি ক্রুকে নিজ হাতে খুন করবে সে বিনা দ্বিধায়। সান্তা ক্রুজেরও প্রত্যেকটি যাত্রী ও ক্রুকে হত্যা করবে, তারপর সী-কক খুলে দিয়ে ডুবিয়ে দেবে জাহাজটা। তার মানে কি দাঁড়াল?'

'বুঝলাম। লেনিন M-315 খোয়া গেলেও নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু কিছুই কি করবার নেই আমাদের?'

'দেখি। ভাবতে হবে। আপাতত এক্ষুণি সিক-বে-তে ফিরে যাওয়া দরকার। ডক্টর সেরভকে রক্ষা করবার একটা প্ল্যানও বের করতে হবে।'

'ডক্টর সেরভ?'

'হ্যাঁ। কোন কৌশল বের না করতে পারলে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম স্বর্গারোহণ করবে ডক্টর সেরভ। অন্তত কয়েক ঘন্টা আগে। বোমাটায় টাইম ফিক্স করবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে তাকে। কারণ আমাদের সবার সঙ্গে ওকেও যদি সান্তা ক্রুজে তোলা হয়, তাহলে রুস্তম একটু দূরে গেলেই

কফিনের ভেতর কি আছে বলে দেবে সে সবাইকে। কাজেই প্রথম হত্যা করা হবে ওকেই। বুঝেছ?'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি আর, রানা! মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি···আমি···'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যোরা। রানার বুকে মুখ গুঁজে আশ্বাস খুঁজল যেন সে। কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর সর্বশরীর কান্নার দমকে। হাত বুলিয়ে দিল রানা ওর পিঠে।

'আহা-হা! কি অপূর্ব দৃশ্য!' তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে উঠল কেউ। 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মুহূর্তেই নাটকটির যবনিকা টানতে হচ্ছে।'

এক ঝট্‌কায় ঘুরল রানা পিছন দিকে। একে গুলি খাওয়া পা, তার ওপর বেধে গেল পা-টা যোরার পায়ে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল রানা। দপ্‌ করে জ্বলে উঠল শক্তিশালী একটা টর্চের আলো রানার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। টর্চের পাশেই পিস্তলের নলটা দেখতে পেল সে পরিষ্কার।

'উঠে দাঁড়াও, মাসুদ রানা।' এবার চিনতে পারল রানা। অব্যর্থ-লক্ষ্য কোহেন। শ্বাপদের মত জ্বলছে ওর চোখ দুটো টর্চের আবছা আলো পড়ে। 'গুলি খেয়ে ঘুরে পড়া দেখতে পছন্দ করি আমি। নিজেকে অতি ধূর্ত, কৌশলী মনে করেছিলে তুমি। উঠে দাঁড়াও। নাকি শুয়ে শুয়েই খেতে চাও গুলিটা?'

একটু ওপরে উঠল পিস্তলের নল। বেশি ভণিতা করবার কিংবা সিনেমার ভিলেনের মত লম্বা চওড়া একখানা বক্তৃতা দেবার লোক কোহেন নয়। সোজা কাজ সেরে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করবে সে। বাম পা-টা বেকায়দা মত পড়েছে দেহের নিচে চাপ খেয়ে, উঠতে পারছে না রানা। কালো নলটার দিকে চেয়ে রইল সে বোকার মত। গাল দুটো একটু কুঁচকে গেল, প্রস্তুত হলো সে গুলি খাওয়ার জন্যে। পাঁচ ফুট দূরত্ব থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না কোহেনের গুলি।

'মেরো না! ওকে মেরো না!' চিৎকার করে উঠল যোরা। ছুটে গেল কোহেনের দিকে। 'ওকে মারলে আমরা সবাই মারা যাব!'

'সরে দাঁড়াও, যোরা হাসান!' চাপা গর্জন করে উঠল কোহেন। ওর কণ্ঠস্বরে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

'লেনিন M-315! ও চালু করে দিয়েছে টাইমিং ডিভাইস্।'

'কি বললে! বোমাটাকে আর্‌ম্‌ করেছে ও?'

'হ্যাঁ, করেছে।'

চারদিকে হাত বাড়াল রানা। এই কয়েকটা সেকেন্ড কাজে লাগাতে হবে।

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল কোহেন। 'ওটার কথা জানলে কি করে জানি না, কিন্তু আর্‌ম্ করতে জানে না মাসুদ রানা।'

'আমি জানি না । কিন্তু ডক্টর নিকোলাই সেরভ জানে।'

এইবার কেঁপে উঠল কোহেনের অন্তরাত্মা। চট্ করে ঘুরে এল টর্চটা কফিনটার ওপর থেকে। সর্বনাশ! যদি ওটাকে···। 'তুমি জানলে কি করে সেরভের কথা?' চিৎকার করে উঠল কোহেন।

'ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার আজ রাতে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'ওর সঙ্গে আলাপ··· কিন্তু এটা আর্‌ম্ করতে চাবি লাগে। চাবিটা ইয়াকুবের পকেটে। মিছে কথা···'

'ডক্টর সেরভের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। ওঁর টোবাকো পাউচের মধ্যে। সেটা তোমরা পরীক্ষা করে দেখোনি, কোহেন।'

'মিছে কথা বলছ তুমি, শয়তান! আমি তোমাদের আগাগোড়া অনুসরণ করেছি আজ। তোমরা কি ভেবেছিলে গার্ডটা মাসুদ রানার দেয়া কফি খাচ্ছে দেখেও সন্দেহ হবে না আমার? লুকিয়ে ছিলাম আমি কাছেই'। রেডিও অফিসের সামনে থেকে চলে এসেছ তোমরা সেরভের কেবিন পর্যন্ত। কিন্তু ভেতরে ঢোকোনি। কিভাবে দেখা হতে পারে তোমাদের সেরভের সঙ্গে?'

'এইখানেই।' রানা বুঝল সময় ফুরিয়ে আসছে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে সে। উঠে বসেছে বহু কষ্টে। 'কৌশলে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কাজে লেগে গিয়েছিলেন তিনি আগেই।' মৃদু হাসল রানা। কোহেনের দুই ফুট ডান দিকে দৃষ্টি ফেলে বলল সে, 'আপনিই বলুন, কমরেড সেরভ।'

ঝট্ করে ঘুরতে গিয়েও সামলে নিল কোহেন। বুঝে ফেলেছে সে রানার কৌশল। এইসব ছেলে ভুলানো ফাঁদে পা দেবার বয়স পার হয়ে গেছে ওর অনেক আগে। মাত্র আধ সেকেন্ড সময় পেল রানা। স্ক্রু ড্রাইভারটার ওপর হাতের মুঠিটা শক্ত হলো মাত্র। এইবার গুলি করবে কোহেন।

কিন্তু পিস্তলটা রানার দিকে তাকই করতে পারল না কোহেন। সতর্ক ছিল যোরা। লাফিয়ে গিয়ে কোহেনের ডান হাত ধরে ঝুলে পড়ল সে। ছুঁড়ে মারল রানা ভারি স্ক্রু ড্রাইভারটা। টর্চ দিয়ে যোরার মাথায় মারতে যাচ্ছিল কোহেন। ঝট্ করে মুখটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে বাম হাতে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে স্ক্রু ড্রাইভারটাকে। প্রচণ্ড বেগে লাগল সেটা কোহেনের কনুইয়ের ওপর। ছিটকে পড়ে গেল টর্চটা হাত থেকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল জায়গাটা। জাহাজটা একধারে কাত হওয়ায় বিশ্রী শব্দ তুলে একটা ভারি বাক্স

এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে গড়াতে গড়াতে। আওয়াজটা থামতে অস্পষ্ট একটা ধস্তাধস্তি আর ফোঁস ফোঁস জোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রানা। আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল সে। বাম পা-টা অকেজো হয়ে গেছে একেবারে। কিন্তু নিজের কথা একবারও ভাবল না রানা—মেরে ফেলছে কোহেন যোরাকে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল যোরা। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ওরা দু'জন মাটিতে। ককিয়ে উঠল যোরা। তারপর আবার চুপ। একটানে ছুরি বের করে এগিয়ে গেল রানা। কিন্তু কোথায় ওরা? গড়িয়ে সরে গেছে। এই যে, আর দুই পা এগিয়েই পেল রানা ওদের। বাম পা-টার ওপরেই এসে পড়ল একটা দেহ। আবার পড়ে গেল রানা—সেই দেহটাও পড়ল রানার ওপর। চুল ধরে সরিয়ে দিল রানা দেহটা গায়ের ওপর থেকে। পরমুহূর্তেই টের পেল ওটা যোরার চুল। আবছা মত দেখল এবার উঠে দাঁড়িয়েছে কোহেন। কোহেনও দেখল রানাকে। এক লাফে এগিয়ে এল কোহেন, পিছিয়ে গেল না। তার মানে, পিস্তলটা খোয়া গেছে ওর! ঝাঁপিয়ে পড়ল কোহেন রানার ওপর ক্ষুধার্ত চিতাবাঘের মত।

পাগলের মত ঘুসি চালাচ্ছে কোহেন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বুকে, পেটে, মুখে। নিজের অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে আসছে রানার। কিন্তু খেপে গেছে রানাও। যত শক্তিশালীই হোক, নিস্তার নেই আজ ওর রানার হাত থেকে। ঠিক সময় মত ছুরিটা চালাল রানা। কিন্তু আটকে গেল সেটা কোহেনের কণ্ঠার হাড়ে। আর্তনাদ করে উঠল কোহেন। একটানে ছুরিটা খুলে নিয়ে আবার বসাল রানা। আবার! আবার!

বুকের ওপর চড়ে রানার গলা টিপে ধরেছে কোহেন দুই হাতে। ক্রমেই বেড়ে চলেছে হাতের চাপ। প্রতিবার ছুরি চালানোর সাথে সাথে যেন আরও বেড়ে চলেছে চাপটা। ছয় বারের বার আর হাত তুলতে পারল না রানা। খসে পড়ে গেল ছুরিটা হাত থেকে।

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যাবার উপক্রম হলো রানার। বুকের ছাতি ফেটে যাবে যেন। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। একটু বাতাস! একটু বাতাস! হঠাৎ বুঝতে পারল রানা, মারা গেছে কোহেন। ঘুসি থেমে গিয়েছিল অনেক আগে। মৃত্যু যন্ত্রণায় আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরেছিল ওর কণ্ঠনালী—মরবার পরও তেমনি আছে সেগুলো। বহুকষ্টে সরিয়ে দিল সে গলা থেকে কোহেনের হাত। পৃথিবীর সমস্ত বাতাস একসাথে বুকের মধ্যে টেনে নিতে চাইল রানার ফুসফুস। চুপচাপ পড়ে রইল আধ মিনিট।

উঠে পড়ো। উঠে পড়ো রানা! রানার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল। বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল ওর অবচেতন মনের মধ্যে। এক্ষুণি উঠে পড়া দরকার। এক্ষুণি। এক ঝটকায় উঠে বসল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

পকেট থেকে ডাকু চাচার দেয়া টর্চটা বের করল রানা। টর্চের আলোতে দেখা গেল বুকের কাছে লালে লাল হয়ে গেছে কোহেনের শার্ট। পাঁচ ফুট দূরেই পড়ে আছে যোরা। অজ্ঞান । হার্ট বিট পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হলো রানা, তারপর আবার ফিরল কোহেনের দিকে। ওকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। এখানে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করলে অনেক কিছুই আন্দাজ করে নেবে ইয়াকুব। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এখানটায় যে একবার খোঁজ পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই রানার। কোহেনকে পাওয়া যাচ্ছে না বুঝতে পারলেই তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হবে পুরোটা জাহাজ। এখানে কোথাও লুকিয়ে রাখা ঠিক হবে না। একটি মাত্র জায়গা আছে লুকিয়ে রাখবার—যেখানে ইয়াকুব কোনদিনই খুঁজে পাবে না ওর প্রিয় সহচরকে—ভূমধ্যসাগর। যোরা অজ্ঞান হয়ে আছে থাক, অবশ্য-কর্তব্যটা সেরে নিতে হবে আগে।

তিরিশ ফুট উঁচুতে উঠতে হবে কোহেনের মৃতদেহ নিয়ে স্টীলের মই বেয়ে। অসম্ভব! প্রায় দু'শো পাউন্ড ওজন কোহেনের। তার ওপর একটা পা প্রায় অকেজো তো বটেই, প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল রানার শরীর। কাজেই অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করল রানা বিশ মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমে। এরই ওপর নির্ভর করছে বহু লোকের প্রাণ। এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি করে তিনশো ষাট ইঞ্চি উঠে এল রানা। ডেকের ওপর মৃতদেহটা শুইয়ে নিজে শুয়ে পড়ল পাশে। দপ্ দপ্ করছে কপালের দুটো শিরা। ঘেমে নেয়ে উঠেছে শরীরটা। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল ওর সেখানেই। কিন্তু পাল্স্ বিট আবার একশো বিশের কাছাকাছি নেমে আসতেই উঠে বসে কোহেনের পকেট থেকে মাস্টার কী-টা বের করে নিল রানা। তারপর কলার ধরে টেনে নিয়ে গেল জাহাজের একধারে রেলিং-এর কাছে। শেষ ধাক্কাটা দেবার সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল রানার আবু তাহেরের মুখটা। প্রতিশোধ নিয়েছে সে আবু তাহেরের মৃত্যুর।

নেমে এল রানা আবার নিচে। টর্চের আলো ফেলল যোরার মুখের ওপর। চোখ দুটো খোলা। আলো পড়তেই ভ্রূ কুঁচকে গেল। জ্ঞান ফিরেছে দেখে আশ্বস্ত হলো রানা।

'উঠে পড়ো, যোরা। আর ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।' নিজের গলা

নিজেই চিনতে পারল না রানা। অদ্ভুত কর্কশ হয়ে গেছে।

কিন্তু যোরা চিনল। চমকে উঠে বসল সে।

'তুমি বেঁচে আছ এখনও! কোহেন কোথায়?'

'ভূমধ্যসাগরে।'

'তুমি খুন করেছ ওকে?'

'না করে উপায় ছিল না।'

'কিন্তু··· কি করে?'

'ওসব কথা পরে শুনো। এখন জলদি উঠে পড়ো। এক্ষুণি ফিরতে হবে আমাদের।'

উঠে পড়ল যোরা। স্ক্রু ড্রাইভার আর ল্যুগার পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখল রানা। তারপর আবার উঠে এল ওরা ওপরে। স্টোরে গিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারটা যথাস্থানে রেখে দিল রানা, তারপর একটা ছোট্ট ক্যানভাসের ব্যাগের মধ্যে দুটো লম্বা নাইলনের রশি ও একটা অপেক্ষাকৃত ছোট নারকেলের কাছি ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। কোথায় কি পাওয়া যাবে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন রানাকে, তাই একমিনিটও লাগল না ওর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো খুঁজে পেতে। রেলিং-এর ধারে যথাস্থানে খুঁটিটা পেল রানা। ছোট কাছিটা অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল সে নিচে।

সিক্ বে-র সেন্ট্রিটা এখনও এই জগতে ফেরেনি। রানা জানে যখন ফিরবে তখন কাউকে ওর ঘুমের কথা বলতে সাহস পাবে না। কোহেনের পকেট থেকে পাওয়া চাবি দিয়ে খুলে ফেলল রানা সিক্ বে-র দরজা। তালা লাগিয়ে গিয়েছিল কোহেন।

ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসে ছিলেন ডাকু চাচা, ক্যাপ্টেন আনসারী আর কমোডোর জুলফিকার দু'জনেই জেগে। গুলি খাওয়ার পর এই প্রথম সজ্ঞানে দেখল রানা কমোডোরকে। মুখখানা অনেকটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, কিন্তু রানা বুঝল, বেঁচে গেলেন তিনি এ যাত্রা।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি, রানা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বলছি। তার আগে এক গ্লাস পানি।'

'সর্বাঙ্গে রক্ত কেন তোমার?' এবার বিস্ফারিত হয়ে গেল কমোডোরের চোখ।

'এ রক্ত আমার না। খোদার কসম। কোহেনের।'

'কোহেনের?' এবার প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ। ওকে খুন করে ফেলে দিয়েছি সাগরে।' পানি খেয়ে গ্লাসটা ফেরত দিল রানা ডাকু চাচাকে। 'কিন্তু গল্প পরে হবে। ইয়াকুব এসে পড়ার আগেই কাপড়গুলো ছেড়ে নিতে হবে আমাকে। তিন মিনিটে আসছি আমি।'

কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রানা শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। নকল গোঁফটা খসে গেল মুখ ধুতে গিয়ে—তাতে দুঃখিত হলো না রানা। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে যোরা খালি বেডটায়। অনেক ধকল গেছে বেচারীর ওপর দিয়ে।

স্প্লিন্টগুলো নিয়ে এসে রানার পায়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন ডাকু চাচা। আর আজকের ঘটনাগুলো বলে গেল রানা গড়গড় করে। ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকছেন কমোডোর এই ক'দিন ধরে—তাই লেনিন M-315 এর কথা বেমালুম চেপে গেল সে।

পনেরো

বেলা এগারোটায় ঘুম ভাঙল রানার। দুঃস্বপ্ন দেখে উঠল। উঠেই দেখল কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে ওকে ইয়াকুব। কেঁপে উঠল রানার বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায়। কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল রানাকে ইয়াকুব বালিশে হেলান দিয়ে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ বিকৃত করে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে ওর।

হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন ডাকু চাচা।

'ওকে ওঠাচ্ছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না কি অবস্থা ওর? কতবার বলতে হবে তোমাদের যে যত শিগ্‌গির সম্ভব মেজর অপারেশন না করলে জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাবে ছেলেটা? তোমরা কি পাষণ্ড? মুমূর্ষু লোকের ওপরও অত্যাচার করতে বাধে না তোমাদের?'

অভিনয়টা এত চমৎকার হলো যে থ হয়ে গেল ইয়াকুব।

'সত্যিই কি ওর এই অবস্থা?'

'তবে কি মিথ্যে বলছি? পাল্‌স্ বিট্‌টা নিজেই পরীক্ষা করে দেখো না? গ্যাস গ্যাংগ্রিনের সমস্ত লক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। দু'দিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।'

রানার করুণ মুখের দিকে চেয়ে কথাটার সত্যতা বিচার করবার চেষ্টা

করল ইয়াকুব।

'কি চাই তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা তিক্ত কণ্ঠে।

'কোহেনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমাকে সার্চ করে দেখতে পারো, নেই আমার কাছে।'

'কখন শেষ দেখেছ তুমি ওকে, মাসুদ রানা?'

'কাল সন্ধ্যায়। সকাল আটটা দুপুর বারোটা আর বিকেল চারটের কোর্স পজিশন নিয়ে এসেছিল সান্তা ক্রুজ ঠিক পথেই চলছে কিনা দেখে দেবার জন্যে।'

'হ্যাঁ। আমিই পাঠিয়েছিলাম ওকে। ওকে কি খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল?'

'দেখাচ্ছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করায় অস্বীকার করেছিল। কিন্তু হঠাৎ গায়েব হয়ে যাবে কি করে?'

'তাই ভাবছি। কিন্তু সমস্ত জাহাজ খুঁজেও পাওয়া যায়নি ওকে। জাহাজে নেই ও। কেউ খুন করে ফেলে দিয়েছে ওকে সাগরে। কিংবা কোনও দুর্ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। যাক, এখন ক্যাপ্টেনকে দিয়ে নতুন ভাবে হিসেব করিয়ে দাও। সান্তা ক্রুজ আর রুস্তম দুটোরই স্পীডে গোলমাল হয়ে গেছে। আপাতত ওই জাহাজটা আগের কোর্সেই চলছে কিনা বের করে দিলেই চলবে। ইন্টারসেপশন টাইমটা পরে বের করলেও হবে।'

ক্যাপ্টেন আনসারী কোর্স বের করে দিলেন। আরও একটা সুখবর দিলেন তিনি, যদিও সমুদ্র শান্ত হতে দেরি আছে, হারিকেনটা সরে গেছে অনেকখানি। চলে গেল ইয়াকুব চার্ট বগলে চেপে।

একটু পরে গলাটা পরিষ্কার করলেন কমোডোর। বললেন, 'তোমার মত মিথ্যাবাদী খুব কমই দেখেছি আমি, রানা। ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয়, তুমি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে চলে আসবে?'

'জ্বি, স্যার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কমোডোর, তারপর বললেন, 'এটাও নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছ?'

'জ্বি, স্যার।'

মৃদু হাসলেন কমোডোর। প্রশ্ন করবার আগেই উত্তরটা জানতেন তিনি।

সারাদিন সময় পেল রানা মনে মনে প্ল্যান ঠিক করবার। রানার ইঙ্গিতে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে কমোডোরকে। বিড় বিড় করে প্রলাপ বকছেন তিনি মাঝে মাঝে। কোহেনের কথা একবারও উচ্চারণ করছেন না দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলো রানা।

সমস্ত ব্যাপার ক্যাপ্টেন আনসারীকে খুলে বলেছে রানা। দু'জন মিলে তৈরি করেছে প্ল্যান। ক্যাপ্টেনের পরামর্শে প্ল্যানের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করে নিয়েছে। আজই এ জাহাজে রানার শেষ রাত। আজই চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে শেষবারের মত। অবশ্য যদি বেরোতে পারে এ-ঘর থেকে।

দুপুরে আবার একবার এল ইয়াকুব চার্ট হাতে।

'এই আমাদের পজিশন আর স্পীড—এবং এই হচ্ছে সান্তা ক্রুজের পজিশন আর স্পীড। ক্রস চিহ্ন দেয়া পয়েন্টে দেখা হবে আমাদের?'

'না,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন তিন মিনিট চিন্তার পর। 'দেখা করতে হলে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু, ক্যাপ্টেন। কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছে আমার হিসেবের সঙ্গে। আমরা রাত দুটোর সময় সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করব চার ঘণ্টা। ঠিক ছ'টার সময় পৌঁছে যাবে সান্তা ক্রুজ।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে জান বেরিয়ে যাবে আপনাদের। সমুদ্র শান্ত হতে অনেক দেরি আছে। স্ট্যাবিলাইজারে কোনও কাজ হবে না। চালু অবস্থায় কাজ করে স্ট্যাবিলাইজার, দাঁড়িয়ে থাকলে বারোটা বেজে যাবে জাহাজের প্রত্যেকটি লোকের।'

'তাই নাকি?' চিন্তিত হয়ে পড়ল ইয়াকুবের মুখ। সে জানে না, ক্যাপ্টেনের মাথার মধ্যে সম্পূর্ণ অন্যরকম চিন্তাধারা চলছে। 'তাহলে স্পীড কমিয়ে সকাল পাঁচটায় ওখানে পৌঁছবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনার সহযোগিতার মাত্রা একটু অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ঠেকছে না? ব্যাপারটা সন্দেজনক, নয় কি?'

'দুষ্ট লোকের মন সব সময়ই সন্দেহপ্রবণ।' কথা বলে উঠল রানা। 'সহযোগিতা আমরা নিজেদের স্বার্থেই করছি। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হতে চাই আমরা। আমাদের সবাইকে সান্তা ক্রুজে উঠিয়ে দিচ্ছ না, ইয়াকুব?'

'কেবল তোমাদের নয়, জাহাজের প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জার, প্রত্যেকটি ক্রুকে তুলে দেয়া হবে সান্তা ক্রুজে। তোমাদের কাউকেই আমার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। অন্তত এই ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো—তোমাদের প্রত্যেককে তুলে দেব আমি সান্তা ক্রুজে। আমি খারাপ লোক হতে পারি, কিন্তু অমানুষ নই।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল রানা। অবশ্য এছাড়া উপায়ও

ছিল না আর।

ডিনারের পর একজন গার্ডের সঙ্গে সিক্ বে-তে এসে ঢুকল যোরা। গার্ডটা বেরিয়ে গেল দরজা বন্ধ করে দিয়ে। বাইরে তালা লাগানোর শব্দে ঘরের সবাই বুঝল আজ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে ইয়াকুব বে। কোহেনের ব্যাপারে সিক্ বে-কেও সন্দেহ করেছে সে। সাবধান হয়ে গেছে সবদিক দিয়ে।

মনে মনে হিসেব কষে রেখেছে রানা। লেনিন M-315-এর ক্লক ডায়াল দেখেই বুঝতে পেরেছে সে, ওটাকে চালু অবস্থায় সাতঘণ্টার বেশি রাখা যাবে না। ভোর সাতটার আগে নিশ্চয়ই ফাটাতে চাইবে না ওটাকে ইয়াকুব—নিজের প্রাণের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে ওর। কাজেই রাত বারোটার আগে ওপরে ওঠার কোনও মানে হয় না।

ঠিক সোয়া বারোটায় তৈরি হয়ে নিল মাসুদ রানা। আবার ইনজেক্শন্ করা হলো ওর পায়ে। ভেতর থেকে চাবি ঢুকিয়ে রাখা হলো দরজার কী হোলে। কাপড় বদলে মুখে হুড বেঁধে নিল রানা। জানালার পাশের বিছানায় বসে খাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছেন ক্যাপ্টেন নাইলন রশির একমাথা। রানার সম্পূর্ণ প্ল্যানটা ক্যাপ্টেন আনসারী ছাড়া কেউ জানে না। গত রাত্রির প্ল্যান শুনেই আঁতকে উঠেছিল সবাই—আজকেরটা শুনলে সোজা পাগল ঠাউরাবে; অসম্ভব, উদ্ভট, ইত্যাদি যুক্তিতে ঠেকাবার চেষ্টা করবে রানাকে, তাই চেপে গেছে রানা। ওদের বুঝিয়েছে পিস্তল দেখিয়ে জাহাজের ব্রিজ দখল করতে চলেছে সে। এটাও পাগলামি, অন্তত যোরা, ডাকু চাচা আর কমোডোরের কাছে তো বটেই—তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে একেবারে মন্দ নয়।

ঠিক সাড়ে বারোটায় নিভে গেল সিক্ বে-র লাইট। কোহেনের পিস্তলটা গুঁজে দিল রানা ক্যাপ্টেনের হাতে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইল। পাকস্থলীতে অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি অনুভব করল সে। রশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। বাতাসের বেগ কমেছে কিন্তু বৃষ্টি পড়েই চলছে। রুস্তমের স্পীড কমিয়ে বারো নটে নিয়ে আসা হয়েছে, কারণ সান্তা ক্রুজ স্পীড কমিয়ে এনেছে দশ নটে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। রশিটা কোথায় গেল বোঝা গেল না। দ্বিতীয় রশিটা কোমরে বেঁধে নিল রানা, ওটার শেষ মাথা ক্যাপ্টেনের হাতে ধরা।

কোনও বিদায় সম্ভাষণ হলো না। টপ্‌কে বেরিয়ে গেল রানা জানালার বাইরে। সবাইকে শুনিয়ে শুধু বলল, 'চললাম।' কেউ কোনও জবাব দিল না।

নেমে এলো রানা আটলান্টিকের মৃত্যুশীতল পানিতে। সিক্ বে-র গরম আবহাওয়া থেকে ঝপ্ করে ঠাণ্ডা পানিতে পড়েই হাত-পা জমে গেল রানার। নিজের অজান্তেই হাত ছুটে গেল রশি থেকে। কি ঘটেছে বুঝতে পেরে পর মুহূর্তেই আতঙ্কিত রানা পাগলের মত হাত বাড়াল চারদিকে। ধরে ফেলল রশিটা আবার। ঠিক সেই সময় ডুবে গেল সে প্রকাণ্ড এক ঢেউয়ের তলায়। প্রবল এক ধাক্কায় ফুসফুসে যেটুকু বাতাস ছিল ভুড়ভুড়ি হয়ে উঠে গেল ওপরে। ঢক ঢক করে দুই ঢোক লবণাক্ত বিস্বাদ পানি খেয়ে ফেলল সে।

বারো নট স্পীডে সমুদ্রের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে রানাকে রুস্তম। কল্পনাও করতে পারেনি সে আগে এর সত্যিকার তাৎপর্য। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বাড়ি খেতে খেতে চলেছে সে। একটা ঢেউ পার হয়ে গেলেই মাথা নিচু করে পড়ছে সে প্রচণ্ড বেগে আরেকটা উঠতি ঢেউয়ের গায়ে। দম নেবার ফুরসত পাচ্ছে না। বড়শিতে গাঁথা মাছের মত বেকায়দা রকম ছটফট করছে রানা আর খাবি খাচ্ছে রশি ধরে ঝুলে। মহাসমুদ্রের কাছে হেরে যাচ্ছে সে—আর বেশিক্ষণ যুঝতে পারবে না। উপরে উঠবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। শ্বাস নেয়ার তাগিদে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পানি খেতে হচ্ছে ওকে। দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমে।

ঠিক সেই সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো রানার প্রতি। মস্ত বড় একটা ঢেউ এসে চিৎ করে ফেলল রানাকে। ঢেউটা পার হয়ে যেতেই এল আরেকটা ঢেউ। কিন্তু এবার সেটার উপর পড়ল রানা পিঠ দিয়ে। বুক ভরে শ্বাস নিল এবার রানা। অবাক হয়ে গেল সে যখন দেখল পরের ঢেউটা বয়ে যাবার পরেও শ্বাস নিতে পারল। ঢেউয়ের ধাক্কায় মাথাটা ভেসে আছে ওর পানির ওপর।

আর সময় নষ্ট না করে ধীরে ধীরে রশি ঢিল দিতে আরম্ভ করল রানা। কোমরে বাঁধা রশিটাতেও সেই অনুপাতে ঢিল দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন। অতি সাবধানে পিছিয়ে এল রানা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট। জাহাজের গায়ে হাতড়ে খুঁজছে সে গত রাতে যে কাছিটা খুঁটিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল সেটা। ঢেউয়ের ধাক্কায় আছড়ে পড়ছে সে জাহাজের গায়ে—আবার ঢিল দিচ্ছে রশি, পানি খাচ্ছে, আবার খুঁজছে হাত বাড়িয়ে গত কালকের সেই নারকেলের কাছি।

যার শুরু আছে তার শেষও আছে। রানা জানে, সব কষ্টেরই শেষ আছে। তাই কাছিটা পেয়েও অতি মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না সে। নিশ্চিন্ত হলো শুধু। নিশ্চিন্ত মনে বমি করল রানা। লবণাক্ত পানি বেরিয়ে গেল পেট

থেকে। অনেকটা হালকা বোধ করল সে এবার—কিন্তু ক্লান্তি বোধ করল দ্বিগুণ। ঝুলানো রশিটা দাঁতে কামড়ে ধরে কোমরে বেঁধে নিল হাতে ধরা রশিটা।

ভেজা পিচ্ছিল কাছি বেয়ে বিশ ফুট উঠে এল রানা। কিভাবে উঠল সে নিজেই জানে না। রেলিং টপকে যখন ওপাশে পৌঁছল তখন টেনে ছেড়ে দেয়া তানপুরার তারের মত কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। আরেকবার বমি করল সে ডেকে শুয়ে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিংবা জ্ঞান হারিয়েছিল— সচকিত হয়ে উঠে বসল সে মিনিট দশেক পর। অনেকটা সুস্থ বোধ করছে এখন।

কোমর থেকে রশি দুটো খুলে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল রানা। তারপর ক্যাপ্টেনের হাতে ধরা রশিটায় টান দিল তিনবার। তার মানে পৌঁছে গেছে সে। ওপাশ থেকেও সিগন্যাল এল—বুঝতে পেরেছেন ক্যাপ্টেন। মানস চোখে দেখতে পেল রানা ক্যাপ্টেন আনসারীর মুখ। মৃদু হেসে খবরটা জানাচ্ছেন তিনি এখন যোরাদের।

নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা চার নম্বর হোল্ডের দিকে। গর্তের মুখটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এখনও কাজ শুরু হয়নি ওদের। কাজেই সময় পাবে রানা অন্য দু'একটা কাজ সারবার। রেডিও অফিসের সামনে চলে এল সে। অন্ধকার। গতরাত্রির মত দরজায় কান পাতল। কোনও শব্দ নেই।

হাতলটা পরীক্ষা করতে গিয়েই চমকে উঠল রানা। টেলিফোন বেজে উঠেছে ঘরের ভেতর। মৃদু কথাবার্তা শুনতে পেল রানা। জ্বলে উঠল লাইট। পায়ে-পায়ে সরে গেল রানা নিরাপদ দূরত্বে। খুলে গেল দরজা। দুটো জিনিস দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। এক, প্যান্টের ডান পকেট থেকে চাবি বের করল লোকটা। আর দুই, এই লোকটাই ইচ্ছাকৃতভাবে পা পিছলে পড়েছিল সিঁড়ি দিয়ে রানাকে নিয়ে নামবার সময়। এই মুহূর্তে দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেলবার প্রলোভনটা সংবরণ করল রানা। কিন্তু চাবিটা হস্তগত করতেই হবে—মাস্টার কী-তে কাজ হবে না—এটা কড়ার সঙ্গে লাগানো আল্‌গা তালা।

দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়ে নেমে গেল লোকটা এ' ডেকে। সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এল রানা ওর পিছু পিছু। ডক্টর সেরভের কেবিনটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। নিচে একজনের হাতে টর্চ জ্বলে উঠল। তিনজন লোক বেরিয়ে এল ডক্টর সেরভের কেবিন থেকে। দু'জনকে পরিষ্কার চিনতে পারল রানা। ইয়াকুব আর সেরভ। পাঁচজন ওরা চলে গেল। রানা জানে কোথায় যাচ্ছে, কিন্তু পিছু নিল না সে।

ম্যাখারভ বলেছিল, বোমাটাকে আরম্ করতে দশ মিনিট সময় লাগে।

এই দশটা মিনিট কাজে লাগাতে হবে। বেচারা সেরভ জানেও না মাত্র দশ মিনিট আছে ওর আয়ু।

তরতর করে নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে। আর মাত্র পাঁচ ধাপ আছে এমনি সময় থমকে দাঁড়াল রানা। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল সে। দু'জন লোক এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। নিচু গলায় কথা বলছে ওরা। সশস্ত্র গার্ড দু'জন। সিঁড়ির কাছে চলে এসেছে একেবারে।

আর রক্ষা নেই। ছুরিটা শক্ত করে ধরল রানা। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে এসেই ডান দিকে ঘুরে গেল ওরা। চলে গেল পাশ কাটিয়ে। কালো কাপড় ও হুড থাকায় এড়িয়ে গেল ওদের চোখ। তাছাড়া বৃষ্টির ছাঁট থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে মাথা নিচু করে রেখেছিল ওরা খুব সম্ভব। লোক দুটো চোখের আড়াল হতেই সশব্দে দম ফেলল রানা। খেয়ালই করেনি, এতক্ষণ দম বন্ধ করে রেখেছিল সে।

ইয়াকুবের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। মাস্টার-কী ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকে আবার চাবি লাগিয়ে চাবিটা রেখে দিল রানা গর্তের মধ্যেই।

লাইট জ্বলছে ঘরের মধ্যে। চারপাশে চোখ বুলিয়ে প্রথমে নিশ্চিত হলো রানা, দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি নেই ঘরে। দশ মিনিটের দু'মিনিট পার হয়ে গেছে। দ্রুত কাজ করবার তাগিদ অনুভব করল সে নিজের ভেতর। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করল সারা ঘর।

কোথায় থাকতে পারে? সান্তা ক্রুজের লোডিং প্ল্যান আছে ওর কেবিনে—গর্ব করে বলেছিল ইয়াকুব। কিন্তু কোথায় সেটা? ওয়ারড্রোব, কাবার্ড, ড্রেসিং টেবিল তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। নাহ্। তবে কি সেটা এখন ওর পকেটে?

আর ছ'মিনিট আছে সেরভের আয়ু। মাথা থেকে সে-চিন্তা দূর করে বর্তমান সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করল রানা। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। কোথায় রাখতে পারে সেটা ইয়াকুব? লুকিয়ে রাখবে নিশ্চয়ই—কাজেই ওয়ারড্রোব, কাবার্ড আর ড্রেসিং টেবিল খোঁজাটা বোকামি হয়ে গেছে, সময় নষ্ট হয়েছে শুধু শুধু। দুত্তোর! আবার সে বাজে কথা ভাবছে। যে সময়টা গেছে সেটা গেছেই, এখন ভাবতে হবে—বিছানা? না। বালিশ? না। সুটকেস? না। কার্পেট?

একটানে তুলে ফেলল রানা একধারের কার্পেট। নেই। কিন্তু আরেক দিকের কার্পেট খানিকটা তুলতেই চোখে পড়ল ওর এক টুকরো কাগজ। চার

ভাঁজ করা অফসেট পেপার।

সান্তা ক্রুজের ডায়াগ্রাম। ফোর ও অ্যাফট ডেকের ক্রেটগুলো পরিষ্কার দেখানো আছে। ফোর ডেকের দশটা ক্রেটের গায়ে লাল চিহ্ন দেয়া। তার মানে ওগুলোর মধ্যে করে লন্ডনের ডায়মন্ড করপোরেশনের জন্যে যাচ্ছে চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের আনকাট ডায়মন্ড।

একটা স্টার মার্ক দিয়ে নিচে এক জায়গায় নোট লিখে রেখেছে ইয়াকুব: 'ডেকের প্রত্যেকটা কারগো ক্রেটের সাইজ সমান।' তার নিচে লেখা ডায়মন্ড ক্রেটগুলোর সাথে অন্যান্য ক্রেটগুলোর কোন রকম বৈসাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটা ক্রেটের গায়েই লেখা আছে 'ইন্টারন্যাশনাল সীড সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড।' মাল—কফির বীজ। সামনের ডেকের কারগো যাচ্ছে লিভারপুলে, আর পিছনের ডেকের কারগো যাচ্ছে ব্রিস্টলে। আসলে সামনের ডেকের ডেস্টিনেশন লিভারপুল লেখা প্রথম দশটা ক্রেটের মধ্যে আছে ডায়মন্ড।

ধীরে সুস্থে প্রত্যেকটি শব্দ মুখস্থ করল রানা। সময় ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করল না সে। বার বার পড়ে যখন স্থির নিশ্চিত হলো যে একটি শব্দও ভুলে যাবে না তখন ঠিক যেমনভাবে ছিল তেমনি ভাঁজ করে রেখে দিল রানা কাগজটা। তারপর কার্পেট সমান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে চেয়ে দেখল ওর উপস্থিতি টের পাবার মত কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে কিনা। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না ওর। চাবি লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে কেবিন থেকে।

ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। শীতকালীন বৃষ্টি। রানা লক্ষ করল, ঠকঠক করে কাঁপছে সে। কপালে হাত দিয়ে দেখল গা গরম। জ্বর আসছে ওর। কিন্তু আসল কাজ তো বাকিই রয়ে গেছে। এখনই কাঁপলে চলবে কেন? দ্রুত উপস্থিত হলো সে চার নম্বর হোল্ডের কাছে।

ক্যানভাসটা সরানো। চারদিক একবার ভাল করে চেয়ে নিয়ে গর্তমুখে উঁকি দিল রানা। পাঁচজন লোক দেখতে পেল সে তিরিশ ফুট নিচে। দু'জনের হাতে টর্চ জ্বলছে, ইয়াকুব দাঁড়িয়ে আছে পিস্তল হাতে, আর ডক্টর সেরভ ঝুঁকে পড়েছে লেনিন M-315-এর উপর—পঞ্চম ব্যক্তিটি হাঁটু গেড়ে বসে ব্যস্ত হয়ে আছে অ্যামাটলের কফিনটা নিয়ে। দৃশ্যটা কেমন যেন ভৌতিক লাগল রানার কাছে। সরে এল সে গর্তমুখ থেকে কিছুটা দূরে।

আচ্ছা, ডক্টর সেরভ যদি টের পেয়ে থাকে যে কাজ ফুরোলেই খুন করা হবে তাকে, তাহলে? তাহলে এক্ষুণি ফাটিয়ে দেবে নাকি বোমাটা? কথাটা মনে আসতেই আবার এসে উঁকি দিল রানা গর্তমুখে। ডক্টর সেরভ তেমনি

ঝুঁকে আছে বোমাটার ওপর। তার হাবভাব দেখে যে কিছু আন্দাজ করবে তার কোনও উপায় নেই। আবার সরে আসতে গিয়েও থেমে গেল রানা। কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল ডক্টর নিকোলাই সেরভ। অ্যামাটলের ওপর কাজ বোধহয় পরে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে কাজ চলছে এখনও। কাজ শেষ হয়েছে সেরভের।

রানা ভাবল এই মুহূর্তে যদি সেরভকে গুলি করে হত্যা করা হয় ওর কিছুই করবার নেই। এইখানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে চুপচাপ দেখতে হবে ওর মৃত্যু। কিন্তু রানার স্বাভাবিক বুদ্ধি বলল হোল্ডের মধ্যে ওকে হত্যা করা হবে না। ওখানে হত্যা করলে মৃতদেহটা সাগরে ফেলবার জন্যে বয়ে তুলে আনতে হবে উপরে। তার চাইতে ওকে দিয়েই ওপরে ওঠার কাজটা করিয়ে নিয়ে ডেকের ওপর খুন করা বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত, রানা হলে তাই করত।

ইয়াকুবও তাই করল। ইঙ্গিত করল একজনকে কফিনের স্ক্রু-গুলো লাগাবার জন্যে, তারপর রেডিও রূমের সেই অপারেটরকে বলল, 'ওকে ওর কেবিনে নিয়ে যাও। ফিরে এসে রিপোর্ট করবে।'

চট্ করে সরে গেল রানা গর্তমুখ থেকে। উঠতে আরম্ভ করেছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে। মাঝে মাঝে লোকটার হাতে ধরা টর্চের আলো বেরিয়ে আসছে গর্তমুখ দিয়ে বাইরে। সেই আলোয় সাদা দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। একটা মোটা থামের আড়ালে সরে গেল রানা।

ডক্টর সেরভের পিছু পিছু উঠল ওর গার্ড। কর্কশ গলায় কিছু একটা আদেশ দিল। চলতে আরম্ভ করল সেরভ। আর সময় নেই। ছুটতে আরম্ভ করল রানা। ছুরিটা ডানহাতে চলে এসেছে ওর। যতখানি সম্ভব নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। লোকটা এখন একবার পিছন দিকে টর্চ ফেললেই রানার দুঃসাহসের ইতি হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব ভাববার সময় নেই। এমনও হতে পারে ইয়াকুব বা অন্য কোনও একজন লোক এদের পিছু পিছু উঠে এসেছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে রানাকে ওদের পিছন পিছন ধাওয়া করতে। একবারও সেকথা মাথায় এল না রানার। বাঁচাতে হবে সেরভকে—কিন্তু কেমন ভাবে বাঁচাবে জানা নেই ওর।

রানা যখন ঠিক চার ফুট পিছনে, সেই সময় দেখল হাতের সাব-মেশিনগানটা তুলছে লোকটা মাথার ওপরে। ব্যারেলটা ধরে বাঁট দিয়ে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে নিতে চাইছে বোধহয় সে সেরভকে—তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে ফেলে দেবে সাগরে। যেই বাঁট নামাতে আরম্ভ করল নিচের দিকে, অমনি ছুরি চালাল রানা। ঘাড়ের পিছনে। আমূল বসে গেল ছুরিটা। ডানদিকে

হ্যাঁচকা একটা টান দিতেই গলার অর্ধেকটা ফাঁক হয়ে বেরিয়ে এল ক্ষুরধার ছুরি। মাটিতে পড়বার আগেই সাব-মেশিনগানটা ধরে ফেলল রানা শূন্যে। কিন্তু টর্চটা ধরতে পারল না—ফসকে পড়ে গেল সেটা মাটিতে। মৃতদেহটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সেরভ।

'চুপ! কথা বলবেন না!' ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা টর্চটার ওপর। নিভিয়ে ফেলল আলো।

কিন্তু সেইটুকু সময়ের মধ্যে দেখে ফেলেছে সেরভ যা দেখবার। চিনতে পেরেছে সে রানাকে, মৃতদেহটাও নজর এড়ায়নি ওর।

'কি ব্যাপার, মিস্টার মাসুদ···'

'চুপ! যদি বাঁচতে চান, চুপ করুন।' চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কোথাও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে চাইল রানা। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আর দেরি করা চলে না। এক্ষুণি উঠে আসবে ইয়াকুব মৃত লোকটার খোঁজে।

'এইগুলো ধরুন।' টর্চ আর সাব-মেশিনগান গুঁজে দিল রানা সেরভের হাতে। তারপর ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল মৃতদেহটা রেলিং-এর ধারে। ডান পকেট থেকে বের করে নিল রেডিও রুমের চাবিটা।

'লোকটা কি মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সেরভ। রেলিং-এর ধারে চলে এসেছে সে রানার সাথে সাথে।

'হ্যাঁ। আপনাকে মেরে সাগরে ফেলে দেবার নির্দেশ ছিল ওর ওপর।' ঝপাং করে একটা শব্দ হলো নিচের অন্ধকারে। শিউরে উঠল সেরভ।

গর্তমুখের দিকে একবার ফিরে চেয়েই চমকে উঠল রানা। রেলিং-এর ক্যাচ খুলে শুইয়ে দিল খানিকটা রেলিং ডেকের ওপর। তারপর একটানে সেরভের মাথা থেকে পরচুলাটা উঠিয়ে নিয়ে ফেলল রেলিং-এর ধারে। পাশেই নামিয়ে রাখল সাব-মেশিনগানটা। গর্তমুখ থেকে একঝলক আলো বাইরে এসে পড়ায় সাদা সাদা বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে পাচ্ছে রানা আবার। ডক্টর সেরভকে নিয়ে একছুটে ঢুকে পড়ল সে স্টোর রুমের মধ্যে। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সামান্য একটু ফাঁক রাখল শুধু।

উঠে এসেছে ইয়াকুব। পিছনে আরেকজন লোক আছে টর্চ হাতে। গর্ত দিয়ে বেরিয়ে চারদিকে আলো ফেলল ওরা। কেউ নেই কোথাও। কয়েক পা এগিয়েই ইয়াকুবের টর্চটা স্থির হলো খোলা রেলিং-এর ওপর। আরেকটু এগিয়েই চোখে পড়ল ওর পরচুলা আর সাব-মেশিনগান। নিচু হয়ে তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করল সে ওগুলো তারপর আঞ্চলিক তুর্কী ভাষায় কিছু

বলল সঙ্গীকে। পরচুলাটা ছুঁড়ে সাগরে ফেলে দিয়ে সাব-মেশিনগান হাতে ফিরে গেল ওরা চার নম্বর হোল্ডে।

'ইয়াকুবকে খুব খুশি বলে মনে হলো না,' বলল রানা।

'পিশাচ! লোকটা একটা পিশাচ! শুনলেনই তো কি বলল।'

'আমি তুর্কী ভাষা ভাল বুঝি না। আপনি বোঝেন নাকি?'

'পনেরোটা ভাষা জানি আমি।'

'কি বলল ও?'

'গালাগালি করল মৃত লোকটাকে অকথ্য ভাষায়। ওর ধারণা ও আমাকে দিয়েই খুলিয়েছে রেলিং-এর ক্যাচ। এবং আমি ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসায় ধস্তাধস্তি হয়েছে আমাদের মধ্যে। ফলে পরচুলা খসে পড়েছে আমার। দু'জনই জড়াজড়ি করে পানিতে পড়েছি। সাথের লোকটা জাহাজ ঘুরিয়ে খোঁজ করবার কথা বলায় ধমক দিয়েছে ওকে বোকাচণ্ডি বলে। কিন্তু কি ব্যাপার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিস্টার মাসুদ রানা। একটু বুঝিয়ে দেবেন আমাকে দয়া করে?'

রানা দেখল সময় আছে এখন হাতে। খুলে বলল সে তাকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা, দরজার ফাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। চুপচাপ শুনল সেরভ মন দিয়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রানা যতটা জানে জানা হয়ে গেল ডক্টর সেরভের।

বেরিয়ে এল ইয়াকুব ও তার দুই সঙ্গী। গর্তমুখটায় ক্যানভাসের তিরপল ঢেকে দিয়ে চলে গেল ওরা দ্রুত পায়ে।

'এইবার চলুন,' বলল রানা সেরভকে।

'কোথায়?' কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না সেরভের। স্টোরের মধ্যেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে চায় সে।

'আবার নামতে হবে আমাদের ওই হোল্ডের মধ্যে।'

স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে নেমে গেল ওরা নিচে, তিরপল দিয়ে যথাসম্ভব গর্তমুখটা ঢেকে। ডক্টর সেরভের হাতে টর্চটা দিয়ে খুলতে আরম্ভ করল রানা কফিনের স্ক্রু।

'কি করবেন ওটা খুলে?' ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সেরভ।

'কি করছি দেখতেই পাচ্ছেন।'

'কিন্তু সাবধান! বোমাটা আর্‌ম্‌ড্‌!'

'কখন ফাটবে?'

'সাতটার সময়। সকাল সাতটায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত নাজুক জিনিস। এখন একটু ঝাঁকি লাগলে যে-কোনও মুহূর্তে... মিস্টার রানা! সাবধান!' ভয়ে

বিবর্ণ হয়ে গেছে সেরভের মুখ।

'আপনার এত ভয় পাবার কি আছে?' ঢাকনিটা একপাশে নামিয়ে রেখে বলল রানা। 'আপনি ওটাকে আরম্ করেছেন, এখন ডিজার্‌ম্ করুন।'

অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেরভ রানার দিকে।

'এইজন্যেই নেমেছি আবার আমরা এখানে?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া আবার এই দোজখে নামতে যাব কেন?'

'অসম্ভব। ওটাকে ডিজার্‌ম্ করা যাবে না।'

'অসম্ভব মানে? যেমন যেমন করেছেন তার উল্টোটা করে দিন।'

'অসম্ভব!' হতাশ কণ্ঠে বলল সেরভ। 'একবার আর্‌ম্ করা হলে একটা চাবি দিয়ে মেকানিজমটা লক্ করে দিতে হয়। চাবিটা ইয়াকুবের পকেটে।'

ষোলো

বসে পড়ল রানা। তবে কি এত চেষ্টা, এত কষ্ট বৃথাই গেল? অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে আণবিক অস্ত্রটার দিকে। চাবিটা উদ্ধারের নানান রকম উদ্ভট অবাস্তব প্ল্যান এল ওর মাথায়। কিন্তু প্রত্যেকটিকে বাতিল করে দিতে হলো অসম্ভব বলে।

গভীরভাবে চিন্তা করছে রানা। এখন ওর ওপরই নির্ভর করছে এতগুলো লোকের জীবন। তিন মিনিট কোনও কথা বলল না রানা। একদৃষ্টে চেয়ে রইল লেনিন M-315-এর দিকে। তারপর মুচকি হাসল একটু।

'কিছু বুদ্ধি বের করতে পারলেন?' আশান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বৈজ্ঞানিক সেরভ।

'মোটামুটি চলনসই একটা প্ল্যান খাড়া করেছি। কিন্তু জাহাজটা বাঁচানো যাবে না। অবশ্য আমাদের খুব বেশি ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তাতে। একটা জাহাজের টাকায় দুটো জাহাজ বানাব আমরা। জাহাজটা তৈরি করতে এর পিছনে যা টাকা গেছে তার দ্বিগুণ টাকা ইনশিওর করা আছে আমেরিকান আন্ডাররাইটারদের কাছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এতগুলো জীবন রক্ষা পেতে পারে একটা জাহাজের বিনিময়ে—মানুষের প্রাণের চাইতে নিশ্চয়ই জাহাজের মূল্য বেশি নয়? নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছে ইয়াকুব।'

'আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'যে-মুহূর্তে চাবিটা পকেটে রেখেছে সেই মুহূর্তে ও নিজেই নিজের এবং সঙ্গী-সাথীদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে।'

ভয় পেল সেরভ। 'আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো, মিস্টার রানা?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার মাথাটা এখনও ঠিকই আছে। আসুন, একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

'কি করতে চাইছেন?'

'এটাকে এখান থেকে সরাতে হবে।' কফিনের পায়ের কাছে চলে গেল রানা। ঝুঁকে দুই হাতে ধরল বোমার একটা দিক।

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি আপনার!' হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল নিকোলাই সেরভ। ট্রেম্বলার সুইচটার সাথে সার্কিট কানেক্শন্ হয়ে গেছে। এখন ঝাঁকি লেগে সামান্য একটা স্প্রিং-এর টেন্শন্ ছুটে গেলেই ফায়ারিং মেকানিজম্ শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। 'দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফাটবে বোমাটা। এখন এটাকে সরাতে গেলে...'

'আমাকে সাহায্য করবেন কিনা বলুন।'

'ওটাকে না সরিয়ে কিছু করা যায় না? আপনি বুঝতে পারছেন না...

'আমার যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। আপনি কি মনে করেছেন ইয়ার্কি মারছি আমি? এক্ষুণি সরাতে হবে ওটাকে—আপনার সাথে এখানে দাঁড়িয়ে সারারাত তর্কাতর্কি করলে চলবে না। যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও লোক এসে হাজির হতে পারে। সহজ কথাটা বুঝতে চাইছেন না কেন? না সরিয়ে যদি চলত, তাহলে কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁয়ে দেখতে চাইতাম না আমি ওটাকে। এছাড়া আর উপায় নেই। যদি ফাটে, আপনার সাথে আমিও মারা যাচ্ছি। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

জবাব খুঁজে পেল না সেরভ। এগিয়ে এসে অতি সাবধানে ধরল বোমাটার আরেক মাথা। বহু কষ্টে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে সরিয়ে আনল ওরা ওটাকে জাহাজের একপাশে চব্বিশ ফুট দূরে একগাদা ক্যানভাসের কাছে। ঢেকে দিল রানা বোমাটা একরাশ ক্যানভাস দিয়ে।

'কারও চোখে পড়বে না এখানে রাখলে?'

'না। খুঁজতে গেলে তো চোখে পড়বে? খুঁজবেই না ওরা এটাকে।'

'এখন কি করতে চান?'

'পালাতে চাই এখান থেকে। যত শিগ্গির সম্ভব। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক। কিন্তু তার আগে কফিনটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ভেতরে ওজনদার জিনিস কিছু ভরতে হবে, নইলে ধরা পড়ে যাব।'

'তারপর কোথায় যাব আমরা?'

'আপনি কোথায় যাবেন,আবার? আপনাকে থাকতে হবে এখানেই।'

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইল নিকোলাই সেরভ রানার দিকে। কিন্তু রানা যখন বুঝিয়ে দিল কেন ওকে থাকতে হবে এখানে, তখন মৃদু হাসিতে পরিণত হলো ওর বিস্ময়। কৃতজ্ঞচিত্তে হ্যান্ডশেক করল সে রানার সঙ্গে। কিছু বলতে যাচ্ছিল থামিয়ে দিল রানা।

পাঁচ মিনিট পরে উঠে গেল রানা সিঁড়ি বেয়ে কফিনের স্ক্রু লাগিয়ে স্ক্রু ড্রাইভারটা পকেটে নিয়ে। প্রবল বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। বড় বড় ফোঁটাগুলো ডেকের ওপর পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে লাফিয়ে উঠছে আধ হাত ওপরে। ভূতের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানার ছায়ামূর্তি ওয়্যারলেস অফিসের দিকে।

বেরিয়ে গেল একজন রেডিও-রুম থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে। রানা বুঝল সোজা ব্রিজে চলেছে লোকটা ইয়াকুব বে-কে সান্তা ক্রুজের কোর্স পজিশন আর স্পীড জানাতে। তার মানে পনেরো মিনিটের মধ্যেই চার্ট বগলে চেপে পৌঁছে যাবে ইয়াকুব সিক্ বে-তে। এক্ষুণি কাজ সেরে নিজ বিছানায় ফিরে যেতে হবে রানাকে। এই লোকটাকে খুন করলে এখন লাভ নেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একে খুঁজতে লোক পাঠাবে ইয়াকুব। এই লোকও যদি গায়েব হয়ে যায় তাহলে ফেঁসে যাবে সবকিছু। দশ মিনিটের মধ্যে যে করে হোক পৌঁছুতে হবে রানাকে নিজের বিছানায়।

লোকটা দশ গজ যেতেই নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলো রানা। দ্রুত তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে সান্তা ক্রুজের কল্ সাইন ট্যাপ্ করল রানা। দ্বিতীয় বারেই উত্তর পেল সে। সদা সতর্ক হয়ে আছে সান্তা ক্রুজে ইয়াকুবের নিযুক্ত অপারেটার।

মেসেজটা শুরু করল রানা 'টপ প্রাইয়োরিটি, আর্জেন্ট ইমিডিয়েট রিপিট ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন মাস্টার (ক্যাপ্টেন) সান্তা ক্রুজ' দিয়ে। শেষ করল 'ফ্রম দা অফিস্ অভ দা পারমানেন্ট সেক্রেটারি, বোর্ড অভ ট্রেড, বাই দা হ্যান্ড অভ রেসিডেন্ট ডিরেক্টর রবার্ট, উইলিয়াম, ডায়মন্ড করপোরেশন, ফ্রী টাউন, সিয়েরা লিওন' দিয়ে।

লাইট নিভিয়ে দরজা খুলে মাথা বের করল রানা বাইরে। কেউ নেই। দরজায় তালা লাগিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল চাবিটা আটলান্টিক মহাসাগরে।

দশ মিনিট পর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে জানালা দিয়ে উঠে এল চুপচুপে ভেজা মাসুদ রানা সিক বে-র গরম অভ্যন্তরে। কি ভাবে এসে

পৌঁছেচে রানা নিজেই জানে না। ক্যাপ্টেন, যোরা আর ডাকু চাচা তিনজন মিলে টেনে তুলেছে ওকে ওপরে। প্রথমেই রশিগুলো কোমর থেকে খুলে ফেলে দিল রানা সাগরে। জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিতেই লাইট জ্বেলে দিলেন ডাকু চাচা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কমোডোর রানার দিকে, জেগে বসে আছেন তিনি রানার জন্যে।

'শুধু শুধুই হয়রান হলে, রানা, পারলে না ব্রিজ দখল করতে,' বললেন কমোডোর নিস্তেজ হতাশ কণ্ঠে। রানার ওপর বড় বেশি ভরসা করেছিলেন তিনি। যতখানি নয় ততখানি মনে করেছিলেন ওকে। এতদিনে ভুল ভাঙল তাঁর।

ভুল ভেঙেছে যোরারও। কেন জানি ওর মনে একটা স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল রানার পক্ষে অসম্ভব কোন কাজ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে এই লোকও বিফল হয়ে ফিরে আসে। তার কল্পনার দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ নায়ক সাধারণ একটা মানুষে পরিণত হলো।

ডাকু চাচাও বুঝলেন যোরা যা বুঝেছে তাই। পারেনি রানা। অপ্রতিভ, সঙ্কুচিত হবে মনে করে তার দিকে চাইলেন না তিনি।

আর ক্যাপ্টেন আনসারী জানেন রানার জানালা দিয়ে ফেরা মানেই যে মিশনে গিয়েছিল সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাছে না-বাচক কিছু শুনতে হয় সেই ভয়ে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না তিনি।

কেউ কোনও অভ্যর্থনা জানাল না রানাকে।

'যোরা, জলদি হিটারটা অন করে দাও। তারপর তোয়ালে দাও আমাকে। এক্ষুণি এসে পড়বে ইয়াকুব। ডাকু চাচা, ধরুন ক্যাপ্টেনকে, ওঁর বিছানায় নিয়ে যেতে হবে ওঁকে। কি ব্যাপার, নড়ছেন না কেন?'

তাড়া খেয়ে ধরলেন এসে ডাকু চাচা ক্যাপ্টেনকে। রানা ধরল এক হাত। শুইয়ে দিল ওরা ক্যাপ্টেনকে তাঁর বিছানায়। ঢেকে দিল বুক পর্যন্ত কম্বল দিয়ে।

'আপনি ভয়ানক কাঁপছেন, মেজর রানা। জলদি কাপড় ছেড়ে ফেলুন।' বললেন ক্যাপ্টেন আনসারী।

'হ্যাঁ, খুলছি।'

জামা খুলে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছে ফেলল রানা। বদলে নিল কাপড়, কিন্তু কাঁপুনি বন্ধ হলো না।

'দরজার চাবিটা! চাবি দেয়া দরজায়!' হঠাৎ মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের।

'ওহ্-হো!' ভুলেই গেছিল রানা। 'যোরা, জলদি খুলে নাও চাবিটা।

ক্যাপ্টেন, পিস্তলটা দিন।' চাবি, পিস্তল আর ভেজা জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা জানালা খুলে বাইরে। স্ক্রু ড্রাইভারটা শুধু রাখল সাথে। 'এবার সবাইকে শুয়ে পড়তে হবে যে-যার বিছানায়। ডাকু চাচা আমার পা বেঁধে দিতে হবে। রেডি হয়ে নিন।' চুলগুলো যথা সম্ভব ভাল করে মুছে চিরুনি বুলিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা নিজের বিছানায়। ঝটপট স্প্লিন্টার বেঁধে দিলেন ডাক্তার। তারপর ক্লিক করে অফ্ হয়ে গেল বাতিটা। অন্ধকার হয়ে গেল সিক্ বে-র অভ্যন্তর।

'কোনও কিছু ভুল হয়েছে আমার? কোনও কিছু, যেটা দেখলেই ইয়াকুব টের পাবে যে বাইরে বেরিয়েছিলাম আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা সবাইকে।

'না, তেমন কিছুই তো মনে আসছে না,' উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

'ভয়ানক শীত লাগছে। ব্র্যান্ডি খাওয়াতে পারবেন, ডাকু চাচা?'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে প্রায় এক গ্লাস ভর্তি ব্র্যান্ডি নিয়ে এলেন ডাকু চাচা। ঢক ঢক করে সেটুকু খেয়ে ফেরত দিল রানা গ্লাসটা। জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল অ্যালকোহল পাকস্থলীতে। কিছুটা সুস্থ বোধ করল রানা এবার। কিন্তু কাঁপুনি বন্ধ হলো না।

ফিসফিস করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কেউ আসছে।'

খুলে গেল দরজা। জ্বলে উঠল উজ্জ্বল বাতিটা। রানার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ইয়াকুব। বগল তলায় চার্ট। ভুরু কুঁচকে চাইল রানা ওর দিকে।

'কি ব্যাপার? জেগে আছ এখনও? কাঁপছ কেন এমন করে?' জিজ্ঞেস করল ইয়াকুব সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

'ভয়ে। তোমার ভয়ে।'

'ইয়াকুব!' গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে ডিসপেন্সারীর দরজা দিয়ে এসে দাঁড়ালেন ডাকু চাচা। 'আশ্চর্য! এত রাতে এই অসুস্থ ছেলেটাকে…'

'চুপ করুন!' ধমকে উঠল ইয়াকুব।

'চুপ করব? কেন চুপ করব? আমি ডাক্তার, আমার পেশেন্টের সুবিধা অসুবিধার কথা বলবার হক আছে আমার। মাসুদ রানা এখন মৃত্যুশয্যায়। নিশ্চিন্তে মরতেও কি দেবে না তোমরা ওকে? ফেমুর-এর কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার এখন গ্যাংগ্রিনের বাসা হয়েছে। তার ওপর নিউমোনিয়া। লাংসে এত রস জমেছে যে ঠিকমত শ্বাসও নিতে পারছে না ও এখন। টেম্পারেচার একশো চার। কিছুতেই নামছে না। ঘেমে নেয়ে উঠছে বেচারা থেকে থেকে। দয়া করে আর কষ্ট দিয়ো না ওকে, ইয়াকুব—যাও তুমি এখন।'

'দিন দেখি আপনার চার্ট,' কথা বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'ওই বেচারাকে

দিয়ে আর কথা বলাবেন না।' হাত বাড়িয়ে চার্টটা নিলেন ক্যাপ্টেন। কিছুক্ষণ হিসেব করে বললেন, 'পৌনে পাঁচটায় পৌঁছবেন আপনি এই পয়েন্টে।'

চলে যাচ্ছিল ইয়াকুব, রানা জিজ্ঞেস করল, 'সান্তা ক্রুজকে থামাচ্ছ কি করে তুমি?'

'একটা গোলা মেরেই থামবার জন্যে সিগন্যাল দেব। বাধ্য হবে থামতে।'

'হাসালে দেখছি!' মৃদু হেসে চুপ করে গেল রানা।

তিনটে লম্বা পদক্ষেপে রানার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ইয়াকুব।

'তার মানে?'

'এত কষ্ট করবার পর তোমার মত লোক যে তীরে এসে তরী ডুবাতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।' কিছু বলতে যাচ্ছিল ইয়াকুব, হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল রানা: 'সান্তা ক্রুজকে থামানোর ব্যাপারে তোমার সমানই আগ্রহ আমার। হীরের আমি এক কানা পয়সাও দাম দিই না। কিন্তু যত শিগ্গির সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হতে চাই আমি। আমার প্রাণের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি।'

'বলে যাও,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ইয়াকুব।

'ছ'টার সময় আসছে সান্তা ক্রুজ ইন্টারসেপটিং পয়েন্টে। এই এলাকায় ছ'টার সময়ই ভোর। সান্তা ক্রুজ-এর মাস্টার পরিষ্কার দেখতে পাবে এই জাহাজ। এত জায়গা থাকতে ওদের দিকে এগোতে দেখলেই সন্দেহ হবে মাস্টারের। হীরা বয়ে নিয়ে চলছে, সেই জ্ঞানটুকু নিশ্চয় তার আছে। দূর থেকে এগোতে দেখেই ঘুরে পালাবে সান্তা ক্রুজ। ন্যাভাল গানারী সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তোমাদের। আধো-অন্ধকার এই বৃষ্টির মধ্যে তোমরা একটা গোলাও লাগাতে পারবে না ওর গায়ে। তোমার ফিট করা ওইসব খেলনা কামান দিয়ে তো নয়ই।'

'খেলনা কামান ওগুলো নয়। সেভেনটি ফাইভ মিলিমিটার। অটোমেটিক।'

'দুটো গোলা ছোঁড়ার পরই খেলনা বনে যাবে ওগুলো। ডেক প্লেটগুলো দুমড়ে মুচড়ে অকেজো হয়ে যাবে। কিভাবে থামাবে ওটাকে? ষোলো হাজার টনের আধুনিকতম প্যাসেঞ্জার-কাম-কারগো জাহাজ তো আর পিস্তল দেখিয়ে থামাতে পারবে না!'

'থামাতেই হবে আমাকে। যে ভাবে পারি থামাব আমি!' চোখ গরম করে চাইল ইয়াকুব রানার দিকে।

'আমার ওপর চোখ গরম করে আর কি হবে? যেটা সত্য সেটাই বললাম। কিন্তু জাহাজটা থামানো আমারও দরকার, তাই কৌশল বের করেছি আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে।'

'কি কৌশল?' জ্বলজ্বল করে উঠল ইয়াকুবের চোখ। পরিষ্কার বুঝেছে তার নিজের প্ল্যানে ত্রুটি আছে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' হঠাৎ কথা বলে উঠলেন কমোডোর জুলফিকার। ওঁর কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। 'বাধ্য হয়ে চার্ট-ওয়ার্ক করা এক কথা, আর একটা হীন দস্যুর হীন চক্রান্তকে সফল করবার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমি সব শুনেছি, মাসুদ রানা। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না একটু?'

'নিশ্চয়ই না। আমি একা নিজের জন্যে করছি না এ-কাজ। আপনাদের দু'জনেরও হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দরকার। ব্যাপারটা খুব সহজ, ইয়াকুব। রাডার-স্কোপে যখন দেখবে আর কয়েক মাইল আছে, অমনি ডিসট্রেস সিগন্যাল দিতে আরম্ভ করবে। আরেকটা কাজ করতে পারো সেই সাথে। এক্ষুণি সান্তা ক্রুজে তোমার যে লোক আছে তাকে বলে দাও যেন সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে রাখে যে এম. ভি. রুস্তম থেকে এসওএস সিগন্যাল পেয়েছে সে। জাহাজটা কাছাকাছি আসতেই মেসেজ পাঠাবে যে হারিকেনের ভেতর পড়ায় এঞ্জিনরুমের প্লেট ফেটে গেছে। ডুবে যাচ্ছে এই জাহাজ। যখন গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াবে সান্তা ক্রুজ, কামানের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলবে তিরপল—আর পালাবার পথ থাকবে না ওর।'

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ছিল ইয়াকুব রানার মুখের দিকে। নিজের অজান্তেই মাথা ঝাঁকাল সে একবার। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ।

'তৃতীয় এবং শেষবারের জন্যে অনুরোধ করছি তোমাকে আমি, মাসুদ রানা। চলে এসো আমার দলে। আসবে?'

'নো, থ্যাঙ্কস। নিরাপদে সান্তা ক্রুজে উঠিয়ে দিয়ো, তাতেই কৃতজ্ঞ থাকব।'

'তাই হবে। জাহাজে মাল তোলা হয়ে গেলেই তোমাদের স্ট্রেচারে করে তুলে দেয়া হবে সান্তা ক্রুজে।'

চলে গেল ইয়াকুব। চেয়ে দেখল রানা, বিচিত্র এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে যোরা, ডাকু চাচা আর কমোডোর। ক্যাপ্টেন আনসারী চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণছেন। তাঁর মুখের ভাবটা দেখতে পেল না রানা; কিন্তু যাদেরটা দেখতে পেল, দেখে খুশি হতে পারল না সে।

বিশ্রী একটা নীরবতা বিরাজ করল ঘরের মধ্যে পুরো একটা মিনিট। কেউ

কিছু বলবার ভাষা পেল না। তারপর কথা বলে উঠলেন কমোডোর।

'এজন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাকে, রানা। উপস্থিত সবার লিখিত স্টেটমেন্ট নিয়ে আমিই চার্জটা আনব তোমার বিরুদ্ধে। ছিঃ! এতটা নিচে তুমি নেমে যেতে পারবে ভাবতেও পারিনি আমি।'

বৃদ্ধকে ক্ষমা করে দিল রানা মনে মনে। বলল, 'যত চার্জই আমার বিরুদ্ধে আনুন না কেন, আমারও কিছু বক্তব্য থাকবে। নিজের জান বাঁচানো ফরজ...'

'কেন এই কাজটা করলে তুমি, রানা! কেন?' মনের ভাবটা গোপন রাখতে পারল না যোরা। 'ছিঃ! নিজের স্বার্থটাই দেখলে কেবল? ন্যায়-অন্যায় সব ভেসে গেল নিজের প্রাণের মায়ায়?'

'বাহ্! তুমিও বকতে লেগেছ? ঘণ্টা কয়েক আগেও না তুমি এই জাহাজ থেকে পালাতে পারলে বাঁচতে? কয়েক খণ্ড হীরার দাম বেশি না মানুষের জীবনের দাম বেশি?'

'এইভাবে বাঁচতে চাইনি আমি, রানা। সত্যিই, এত হীন ভাবে তুমি আমাদের বাঁচাবে ভাবতেও পারিনি আমি।'

'নিজের কানকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি, রানা!' বললেন ডাকু চাচা।

'মানুষ বড় স্বার্থপর!' বলল রানা নিজেকে নিজে টিট্‌কারি মেরে। কেউ কোনও উত্তর দিল না। ঘাড় ফিরিয়ে নিল সবাই। কঠিন হয়ে গেছে রানার প্রিয় মুখগুলো। কিন্তু কাউকে দোষারোপ করল না রানা। ক্ষমা করে দিল মনে মনে। মুখ ফিরিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন আনসারীও। কিন্তু তার আগে সবার অলক্ষে চোখ টিপলেন একবার। মুচকে হাসল রানা প্রত্যুত্তরে।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কেউ জিজ্ঞেস করল না ওকে আজ রাতের অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

সতেরো

সোয়া ছয়টায় ঘুম ভাঙল রানার। প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে পাশ ফিরল সে। কেমন একটা আবছা গোলমালের শব্দ কানে এল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছে সে। বাজে কয়টা? ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠল রানা।

'তোমার শয়তানি বুদ্ধি কার্যকর হয়েছে, মাসুদ রানা,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন কমোডোর জুলফিকার। 'রুস্তমের গায়ে লেগে আছে সান্তা ক্রুজ!'

'সামনের দিকে, না পেছন দিকে?' প্রশ্ন করল রানা উত্তেজিত কণ্ঠে।

'পেছন দিকে,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। কমোডোর একটু অবাক হলেন এই হঠাৎ উত্তেজনায়।

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। ক্যাপ্টেন জানেন এই খবরটুকুর ওপর নির্ভর করে বাহান্ন কোটি টাকার হীরা। ভেতর ভেতর অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছে রানা—হাহা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে ওর—কিন্তু হাসলে চলবে না, মুখ গোমড়া করে রাখতে হবে এখন।

ঘরের মধ্যে ফোন বেজে উঠল। ডাকু চাচা তুললেন ফোন। অল্পক্ষণ শুনে নামিয়ে রাখলেন। ঘোষণা করলেন তিনি: 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোক আসছে স্ট্রেচার নিয়ে।'

বাম উরুর স্প্লিন্টগুলোর সঙ্গে আটকে নিল রানা স্ক্রু-ড্রাইভারটা। যোরাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। বোধহয় চলে গেছে বাবার কাছে। প্রত্যেকটি যাত্রীকে একটা করে স্যুটকেস গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিদায় ক্ষণে মনে দুঃখ দিতে চায় না ইয়াকুব।

সাবধানে স্ট্রেচারের ওপর ওদের তিনজনকে তুলে নিয়ে এগোল ছয়জন লোক। পিছনের ডেকের দিকে চলল ওরা। চারদিকে চাইতে চাইতে চলল রানা। চারপাশে কর্মব্যস্ততা। যাত্রী, ক্রু সবাই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। এই ক'দিনের বন্দীদশার অবসান হলো। চারটে ক্রেট ইতোমধ্যেই নামিয়ে আনা হয়েছে সান্তা ক্রুজ থেকে। আরও আসবে ছ'টা। আরেকটু এগিয়েই দেখতে পেল রানা, প্রায় অর্ধেক যাত্রী নিরাপদে পৌঁছে গেছে সান্তা ক্রুজে। নতুন পরিবেশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। জনা দশেক সশস্ত্র গার্ড চোখে পড়ল রানার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ওরা দুই জাহাজের ক্রু-দের ওপর।

বৃষ্টি থেমে গেছে। উত্তর-পশ্চিম থেকে বাতাস উঠেছে একটা। সেই বাতাসে ভেসে চলে যাচ্ছে মেঘগুলো। দু'ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে আকাশ।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার রশিটার ওপর। কাছিটা কেটে দিয়ে গত রাতে যে নাইলন রশিটা খুঁটির সাথে বেঁধেছিল, সেটা। নিশ্চিন্ত মনে ঝুলছে

রশি—মৃদু বাতাস লেগে দুলছে। সর্বনাশ! কারও চোখ পড়লেই কাজ সেরেছে! দ্রুত নিজেই সরিয়ে নিল রানা দৃষ্টিটা। কেউ লক্ষ করবে না রশি। দ্রুত কাজ সেরে এখন পালাতে পারলে বাঁচে ওরা।

শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও ভেতর ভেতর অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করল রানা। ছ'টা বিশ! আর মাত্র চল্লিশ মিনিট আছে সাতটার। আরও তাড়াতাড়ি করছে না কেন ব্যাটারা? ইয়াকুব নিজে কাজ পরিচালনা করছে, চিৎকার করে হুকুম দিচ্ছে, ছুটোছুটি করছে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক। বোমাটা ফাটবার আগে যতদূর সম্ভব সরে যেতে চায় ও। বিস্ফোরণ থেকে তো দূরে সরে যেতে হবেই, রেডিও-অ্যাকটিভ ভস্মের হাত থেকেও রক্ষা পেতে হবে। তার ওপর এই প্রচণ্ড আণবিক বিস্ফোরণে কত বিরাট ঢেউ উঠবে কে জানে!

ইয়াকুবের ইশারায় স্ট্রেচারগুলো চলে গেল সান্তা ক্রুজ-এর ডেকে। রানা চেয়ে দেখল কাছেই রুস্তমের কয়েকজন কর্মচারীর সাথে দাঁড়িয়ে আছে সান্তা ক্রুজের কয়েকজন অফিসার। চিকন লম্বা রাগী চেহারার ইংরেজ ক্যাপ্টেনের ওপরও চোখ পড়ল রানার। পরস্পর কথা বলছে ওরা। ওদের তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে তিনজন সশস্ত্র গার্ড।

'ইয়া আল্লা! বেঁচে আছেন আপনারা? আমরা মনে করেছিলাম...' এগিয়ে এল রুস্তমের চীফ এঞ্জিনিয়ার। নিচু গলায় ক্যাপ্টেনকে কিছু বলল সে। তিনিও এগিয়ে এলেন। 'পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ক্যাপ্টেন জন স্টুয়ার্ট, ইনি কমোডোর জুলফিকার।'

'হাউ ডু ইয়ু ডু।'

'হাউ ডু ইয়ু ডু।'

'ইনি ক্যাপ্টেন আনসারী।'

'হাউ ডু ইয়ু ডু।'

'হাউ ডু ইয়ু ডু।'

'আর ইনি...'

'ওর পরিচয় আমিই দিচ্ছি,' বাধা দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন কমোডোর। 'ইনি সেই ব্যক্তি, যার সাক্ষাৎ সাহায্য এবং কুপরামর্শ না পেলে ওই হীন দস্যুর পক্ষে সম্ভব হত না এই জাহাজ আটক করা। এর নাম মাসুদ রানা, দা বিট্রেয়ার। ওর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করব আমি।'

'মাসুদ রানা!' অবাক হয়ে গেল চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক হয়ে—অসম্ভব...'

'প্রমাণ সাক্ষী সব আছে। এত টাকার হীরা আছে জাহাজে, অন্য একটা

জাহাজ এগিয়ে আসছে দেখলে জাহাজ ঘুরিয়ে পালানোই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা না করে এসওএস সিগন্যাল এবং ডিসট্রেস রকেট দেখে এগিয়ে এসেছেন আপনি. তাই না. ক্যাপ্টেন? আপনাকে জানানো হয়েছে হারিকেনে এঞ্জিনরুমের প্লেট ফেটে ডুবে যাচ্ছে রুস্তম. তাই না?'

'হ্যাঁ। নইলে আমাকে ধরা রুস্তমের কর্ম ছিল না। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আমি জানি, তার কারণ মাসুদ রানা ইয়াকুবকে এই বুদ্ধি দিয়েছে. আমি নিজের কানে শুনেছি। আনসারী শুনেছে. ডাক্তার শুনেছে. যোরা—হাসান খলিলের মেয়ে—সে-ও শুনেছে।' কটমট করে চাইলেন কমোডোর রানার দিকে। 'তোমাকে স্নেহ করতাম ভাবতেও নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে আমার. মাসুদ রানা। ছিঃ. দেশের কলঙ্ক তুমি!'

আহত দৃষ্টিতে চাইল রানা কমোডোরের দিকে। ম্লান হাসি হাসল। তারপর বলল, 'অন্তত একটা ব্যাপারে বাঁচা গেল। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে চলে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি আর সহ্য করতে হবে না আমাকে।'

মুখ ফিরিয়ে নিলেন কমোডোর। কয়েকজনকে নিচু গলায় কিছু বলতেই ক্যাপ্টেন আর কমোডোরকে স্ট্রেচারসুদ্ধ সরিয়ে নেয়া হলো খানিকটা দূরে। একা পড়ে রইল রানা ডেকের ওপর। চুপচাপ শুয়ে শুয়ে মাল ওঠানো দেখতে থাকল রানা। ব্রিস্টল লেখা ক্রেটগুলো তুলে নেয়া হচ্ছে রুস্তমে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। হুড়মুড় করে বাকি প্যাসেঞ্জার ও ক্রু নেমে আসতে থাকল রুস্তম থেকে।

'কেমন আছেন. মিস্টার মাসুদ রানা?' পাশে এসে দাঁড়ালেন কোটিপতি হাসান খলিল। 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেও পরিনি। কিন্তু রোজ শুনি আপনার খবর যোরার কাছে। ও তো আপনার নাম বলতেই অজ্ঞান। কিন্তু এখানে আপনাকে একা ফেলে রেখেছে কেন?'

'কারণ, কমোডোর জুলফিকারের ধারণা আমি সাহায্য করেছি ইয়াকুবকে ওর এই দস্যুবৃত্তিতে।'

'রাবিশ!' ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন হাসান খলিল।

'কিন্তু উনি যা শুনেছেন, তা সত্য।' বোঝাবার চেষ্টা করল রানা ওঁকে।

'আমি বিশ্বাস করিনি। আমি তোমাকে ভাল মত চিনেছি ইয়াং ম্যান। তাছাড়া যোরার কাছেও শুনেছি তোমার কথা। আমাকে কেটে ফেললেও বিশ্বাস করব না আমি একথা।'

'আমিও না,' কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাকু চাচা। 'আমি নিজের

কানে শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।'

'কিন্তু আমি বিশ্বাস করেছি। ভয়ঙ্কর লোক ও। ওর দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়,' বলল যোরা। 'সে-ও এসে দাঁড়িয়েছিল ডাকু চাচার সঙ্গে। 'অন্য কেউ বললে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না আমি। কিন্তু যেটা নিজের কানে শুনেছি...'

লম্বা করে হুইস্‌ল্‌ বাজাল ইয়াকুব। দলে দলে সশস্ত্র লোকগুলো ফিরে যেতে আরম্ভ করল রুস্তমে। মার্চেন্ট নেভির ইউনিফর্‌ম্‌ পরা সান্তা ক্রুজ-এর দু'জন রেডিও অপারেটারও চলে গেল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে।

ঠিক ছ'টা সাতাশে ইয়াকুব চলে এল সান্তা ক্রুজে। কিছু বলল ক্যাপ্টেনকে। শুনতে না পেলেও বুঝতে পারল রানা ইয়াকুবের বক্তব্য। পাকস্থলীতে সেই সুড়সুড়ির মত অনুভূতিটা হলো রানার। মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন জন স্টুয়ার্ট। ফিরে যাচ্ছিল ইয়াকুব, হঠাৎ রানার ওপর নজর পড়তেই এগিয়ে এল।

'হ্যাল্লো, মাসুদ রানা। দেখলে, শেষ পর্যন্ত জয় হলো আমার? কেউ তোমরা ঠেকাতে পারলে না আমাকে। কিন্তু তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখেছে কেন? ও, কমোডোরের কোপ্‌-দৃষ্টিতে পড়েছ বুঝি? এখনও ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পারো। আমি হলপ করে বলতে পারি সেটাই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে। তোমার ভালর জন্যেই বলছি, বিশ্বাস করো...'

'গুড বাই, ইয়াকুব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ইয়াকুব। ছয়জন শক্তিশালী লোক অতি যত্নে অতি সম্মানের সঙ্গে কফিন দুটো নামিয়ে দিল ডেকের ওপর। রানা অনুভব করল পাথরের মূর্তির মত জমে গেছে যোরা হাসান। চেয়ে দেখল বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর নীল চোখ। ও জানে, কি আছে কফিনের ভেতর। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যোরা, হাত বাড়িয়ে চাপ দিল রানা ওর পায়ে।

'চুপ করে থাকো!' ফিসফিস করে বলল রানা। 'যোরা! একদম চুপ।'

শুনতে পেয়েছে যোরা। রানার মুখের ওপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। চুপ হয়ে গেল সে। রানার মধ্যে সেই দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল সে আবার। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে এর মধ্যে।

চলে গেল ইয়াকুবের শেষ লোকটাও। দড়ি কেটে দেয়া হলো। রওনা হয়ে গেল রুস্তম এক মিনিটের মধ্যে। ঘড়ি দেখল রানা, আর আধ ঘণ্টা আছে। দ্রুত সরে যাচ্ছে রুস্তম পুবদিকে। লাল থালার মত সূর্য উঠেছে সেই

দিকটায়।

'চলে গেল হারামজাদা আমাদের জাহাজ নিয়ে,' কর্কশ কণ্ঠে আক্ষেপ করলেন কমোডোর।

'বেশিক্ষণ ওর দখলে থাকবে না ওটা। আর মাত্র আধঘণ্টা,' বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট, এক্ষুণি ছেড়ে দিন জাহাজ। উল্টো দিকে। জলদি।'

'তোমার শেখাতে হবে না। জাহাজ কখন ছাড়তে হবে, কোন্ দিকে চলবে···

'আপনি চুপ করবেন, কমোডোর?' ধমকে উঠল রানা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'দয়া করে? এটা অত্যন্ত আর্জেন্ট ব্যাপার। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট—'

'রাখো তোমার আর্জেন্ট—'

'দয়া করে চুপ করুন, কমোডোর,' বললেন ক্যাপ্টেন আনসারী। 'মেজর রানা যা বলছেন শুনুন। নইলে পরে পস্তাতে হতে পারে। গত রাতে শুধু শুধুই হাওয়া খেতে ওঠেননি উনি ওপরের ডেকে।'

'ধন্যবাদ, আনসারী ' ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের দিকে চেয়ে বলল রানা। 'এক্ষুণি ব্রিজে ফোন করুন। পশ্চিমে যেতে হবে। ফুল স্পীডে। জলদি!'

রানার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু রয়েছে যা উপেক্ষা করতে পারলেন না সান্তা ক্রজের ক্যাপ্টেন। ঝট করে ঘুরে কিছু আদেশ দিলেন তিনি একজন জুনিয়ার অফিসারকে। দৌড় দিল লোকটা আদেশ শোনা মাত্র। এবার ফিরলেন ক্যাপ্টেন রানার দিকে।

'কারণটা জানতে পারি?'

'ওই জাহাজের মধ্যে একটা অ্যাটম বোমা আছে। ঠিক সাতটার সময় ফাটবে ওটা। লেনিন M-315 ওর নাম। রাশানদের তৈরি। বুলগেরিয়ার ভার্না থেকে খোয়া গেছিল সেটা ক'দিন আগে।'

'লেনিন M-315! রেডিও নিউজ শুনেছি আমরা এর সম্পর্কে। কিন্তু ওই জাহাজে এল কি করে ওটা?' বিশ্বাস করতে পারছেন না ক্যাপ্টেন। 'কি আজেবাজে কথা বলছেন? মাথা খারাপ···'

'শুনবেন আমার কথা? মিস যোরা হাসানও দেখেছে ওটা। সত্যি কিনা বলো, যোরা।'

'সত্যি। আমিও দেখেছি ওটা, ক্যাপ্টেন। কিন্তু···'

'কাজেই বুঝতে পারছেন মিছে কথা বলছি না আমি, আর মাথাও আমার ঠিকই আছে। বোমাটা আর পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ফাটবে। সেইজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে গেল ইয়াকুব বে। ওর ধারণা ওটা এই জাহাজে

আছে। সেই একই কারণে আমিও পালিয়ে যেতে চাই উল্টো দিকে। কারণ আমি জানি, ওটা এ জাহাজে নেই—ওই জাহাজেই আছে।'

'কিন্তু এই জাহাজেই তো আছে ওটা!' বলে উঠল যোরা অস্বাভাবিক কণ্ঠে। 'ওই···ওই কফিনের মধ্যে।'

'নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা।

স্পীড বাড়ছে সান্তা ক্রুজের। ছুটে চলেছে ওরা পশ্চিমে, কিন্তু তবু বিছানা ছেড়ে উঠতে ভরসা পেল না রানা। ইয়াকুবের দূরবীনে নিশ্চয়ই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওকে। দশ সেকেন্ড চুপচাপ পড়ে রইল সে। জাহাজটা একটু দিক পরিবর্তন করতেই ইয়াকুবের চোখের আড়াল হলো রানা যেখানে শুয়ে আছে সেই ডেকটা। এবার তড়াক করে উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করে নিয়ে কয়েক টানে খুলে ফেলল স্প্লিন্টগুলো।

তাজ্জব চোখে চেয়ে রইল রুস্তমের ক্রু ও প্যাসেঞ্জাররা। ওরা জানত ঊরুর হাড় ভেঙে গেছে রানার। ওকে স্প্লিন্ট খুলতে দেখে মনে করল বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে সে। কিন্তু ওদের মুখের ভাব দেখবার সময় নেই রানার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে হাজির হলো সে একটা কফিনের সামনে স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কাছে এসে দাঁড়ালেন দ্রুত পায়ে। 'কি করছেন আপনি? লাশ আছে ওর ভেতর। গ্রীক এমব্যাসীর···'

'তাই নাকি?' তিনটে টোকা দিল রানা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কফিনের ঢাকনিটার ওপর। সাথে সাথেই ভেতর থেকে তিনটে টোকার শব্দ শোনা গেল প্রত্যুত্তরে। চারপাশের ভীত কৌতূহলী দর্শকের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'মরা মানুষ জ্যান্ত করে দেব। যে যা পারেন দু'চার পয়সা ফেলুন তাড়াতাড়ি। ভোজবাজি দেখাচ্ছি।'

ডালাটা খুলে ফেলতেই তড়াক করে উঠে বসল ডক্টর নিকোলাই সেরভ। পিছিয়ে গেল দর্শকবৃন্দ কয়েক পা। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে বুঝতে পারল সেরভ বিপদ কেটে গেছে। আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় বুকে জড়িয়ে ধরল সে রানাকে।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, মাসুদ রানা। চিরঋণী হয়ে থাকলাম আমি তোমার কাছে। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করো।'

ভাবালুতার সময় নেই রানার। সেরভের বাহু বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিল সে নিজেকে। বলল, 'ওসব বলে লজ্জা দেবেন না। আমার কর্তব্য আমি করেছি। এর ফলে আমাদের দুই দেশের মধ্যে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও

একটু গাঢ় হয় তাহলেই আমি খুশি।'

এগিয়ে গেল রানা দ্বিতীয় কফিনটার দিকে। দুর্বলতার ফলে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন ওকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। ওর হাত থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা নিয়ে নিজেই খুলতে আরম্ভ করলেন কফিনের স্ক্রুগুলো। রানা ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজতে সতেরো মিনিট।

এর মধ্যে থেকে কি বেরোবে?' স্ক্রু খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'এক্সপ্লোসিভ। অ্যামাটোল। যদি লেনিন M-315-এর মেকানিজম ঠিকমত কাজ না করে তাহলে সিমপ্যাথেটিক ডিটোনেশন দিয়ে যাতে ফাটানো যায় সেজন্যে বোধহয় এই ব্যবস্থা। ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু জানি—সান্তা ক্রুজকে ডুবিয়ে দেয়ার পক্ষে এই বোমাটাও যথেষ্ট।'

থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'এটাকে না খুলে সাগরে ফেলে দিলে হয় না?'

'বিপদজনক। ফাটবার সময় হয়ে এসেছে। আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে। সামান্য ঝাঁকিতেও ফেটে যেতে পারে।'

ভয়ে ভয়ে ডালাটা তুললেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। এগিয়ে গেল রানা।

কম্বলটা তুলে প্রাইমার আর ডিটোনেটারটা খুঁজে বের করল রানা। ইনসেট ডিটোনেটারের লম্বা সরু সীসা দুটো অতি সাবধানে এক এক করে কেটে দিল ছুরি দিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াল। বিকল হয়ে গেছে বোমাটা।

'রানা! এদিকে এসো।' ডাকলেন কমোডোর জুলফিকার নিরুত্তাপ কণ্ঠে। রানা গিয়ে দাঁড়াল ওঁর বিছানার পাশে। 'ডক্টর নিকোলাই সেরভ—কফিন বদলি—কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। বুঝিয়ে দেবে একটু?' কণ্ঠস্বর থেকে সোডা ওয়াটারের ঝাঁঝ উবে গেছে বেমালুম।

অল্প কথায় গুছিয়ে বলল রানা সবকিছু। চুপচাপ চেয়ে রইলেন তিনি রানার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার কাছে বোধহয় আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বয়সের এতটা তফাৎ না থাকলে হয়তো চেয়েই বসতাম। নাহ্, মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছেই চেয়ে নেব। কিন্তু রুস্তমের জন্যে বড্ড খারাপ লাগছে। জাহাজটা বড় ভাল ছিল, হে। এই ক'দিনেই একটা মায়া জন্মে গেছিল ওটার ওপর।' অল্পক্ষণ থেমে বললেন, 'ইয়াকুব দুষ্ট লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু ভাবতে খারাপ লাগছে পঁয়তাল্লিশ জন লোক মারা যাচ্ছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে। পঁয়তাল্লিশ জন লোককে খুন করলে তুমি, রানা।'

'নইলে আমরা দুইশোজন লোক খুন হতাম ইয়াকুবের হাতে,' বললেন

হাসান খলিল।

'এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, স্যার,' বলল রানা বিনয়ের সঙ্গে।

'এখনও তো ওকে সাবধান করে দেয়া যায়?' বললেন কমোডোর।

'কি ভাবে?'

'ওয়্যারলেসে। এখনও ছয় মিনিট আছে।'

রানা চেয়ে রয়েছে বারো মাইল দূরের আবছা জাহাজটার দিকে। দ্রুত সরে যাচ্ছে রুস্তম। ঠাণ্ডা বাতাসটা পশ্চিমের মেঘ নিয়ে যাচ্ছে পুবে। বলল, 'সে পথ বন্ধ। যাবার আগে ভেঙে দিয়ে গেছে ওরা সান্তা ক্রুজের ট্র্যান্সমিটার।'

'কি বললেন?' ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট চেপে ধরলেন রানার কাঁধ। 'ভেঙে দিয়ে গেছে? কে বলল আপনাকে? আপনি জানলেন কি করে?'

'বুদ্ধি খরচ করে। আপনি কি মনে করেছেন রুস্তম সরে যাওয়ার সাথে সাথেই চারদিকে খবর পাঠাবার সুযোগ দিয়ে যাবে আপনাকে ইয়াকুব? ওর লোক দু'জন যাবার আগে নিশ্চয়ই শেষ করে দিয়ে গেছে ট্র্যান্সমিটার। খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

খোঁজ নিতে গেল সেই জুনিয়ার অফিসার। আধমিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে।

'সব শেষ,' বলল সে গম্ভীর কণ্ঠে।

'নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে ইয়াকুব,' বলল রানা। 'ওকে ঠেকাবার সাধ্য এখন খোদ শয়তানেরও নেই।'

নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রুস্তম। তেরো মাইল তফাতে রয়েছে ওরা—নীলচে-সাদা একটা তীব্র জ্যোতি দপ্ করে জ্বলে উঠতেই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আঁধার হয়ে গেল সবার চোখ। দাউ দাউ করে এক ঝলক আগুন যেন মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেল আরও ওপরে। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ উঠল সাগরের বুক থেকে ওপর দিকে। প্রায় আধ মিনিট ধরে শুধু ওপরে উঠল, তারপর আবার নেমে এল আধ মিনিট ধরে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রুস্তম—এবং সেই সাথে ইয়াকুব ও তার দস্যুদল। প্রচণ্ড শব্দটা এল বেশ কিছুক্ষণ পর। কড়াৎ করে বজ্রপাতের মত শব্দটার পরই টের পেল ওরা শক্-ওয়েভ। দুই মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল সবাই পুব দিকে।

'সব শেষ! ইয়াকুব গেল, জাহাজ গেল, চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ডের ডায়মন্ডও

গেল সেই সাথে!' দুঃখ প্রকাশ পেল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কণ্ঠস্বরে।

'শুধু ইয়াকুব আর জাহাজটা গেছে, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট,' বলল রানা। 'আর গেছে দশ বাক্স কফির বীজ।'

'ওর মধ্যে বীজ নেই, মিস্টার রানা। আছে চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ডের ডায়মন্ড। ডায়মন্ড করপোরেশনের জন্যে যাচ্ছিল ওগুলো ইংল্যান্ডে। কিন্তু ভাবছি ইয়াকুব কি করে...'

'আপনি জানেন ওই বাক্সগুলোর মধ্যে হীরা ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা মৃদু হেসে।

'নিশ্চয়ই। ইন্টারন্যাশনাল সীড সাপ্লাই কোম্পানীর ছদ্মনামেই যাচ্ছিল ওগুলো। সিকিউরিটির জন্যে। আমার ডকুমেন্টে বলে সামনের ডেকের প্রথম দশটা ক্রেটের মধ্যে হীরা আছে, কিন্তু গত রাতে দুটোর সময় মেসেজ এসেছে ফ্রীটাউন থেকে, ভুল হয়েছিল ওদের। ইয়াকুবও নিশ্চয়ই খবরটা পেয়েছিল ওর নিযুক্ত রেডিও অপারেটারের মাধ্যমে। সেই মেসেজের একটা কপি দিয়ে গেছে আমাকে ইয়াকুব।' তিক্ত কণ্ঠে কথা কয়টা বলে বাড়িয়ে দিলেন তিনি একখণ্ড কাগজ রানার দিকে। 'পড়ে দেখতে পারেন।'

রানা নিল না সেটা। মৃদু হেসে বলল, 'ও আর কি দেখব? আমি বলে যাচ্ছি আপনি মিলিয়ে দেখুন। ওর মধ্যে লেখা প্রতিটি শব্দ আমার মুখস্থ আছে। শুনুন: টপ প্রায়োরিটি আর্জেন্ট ইমিডিয়েট রিপিট ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন মাস্টার সান্তা ক্রুজ লোডিং-এ মস্ত ভুল হয়ে গেছে! স্পেশাল কারগো "লিভারপুল" লেখা সামনের ডেকের প্রথম দশটা ক্রেটে নেই, "ব্রিস্টল" লেখা পিছনের ডেকের প্রথম দশটা ক্রেটে আছে। জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়তে পারে জানতে পেরে আপনাকে জানানো হচ্ছে পিছনের ডেকের প্রথম দশটা ক্রেটের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ফ্রম দা অফিস অভ দা পারমানেন্ট সেক্রেটারি, বোর্ড অভ ট্রেড, বাই দা হ্যান্ড অভ দা রেসিডেন্ট ডিরেক্টর রবার্ট উইলিয়াম, ডায়মন্ড করপোরেশন, ফ্রীটাউন, সিয়েরা লিওন। কি, হুবহু মিলে গেছে না?'

হাঁ হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের মুখ। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন তিনি রানার মুখের দিকে। ঢোক গিলে বললেন, 'আ...আপনি জানলেন কি করে?'

'ইয়াকুবের কেবিনে কার্পেটের তলায় ছিল আপনারটার মতই একটা ডায়াগ্রাম আর লোডিং ডকুমেন্ট। আপনারটারই ডুপ্লিকেট কপি। ওটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আপনার হাতের এই মেসেজটা রাত দুটোর সময়

আমিই পাঠিয়েছিলাম রুস্তমের রেডিও রুম থেকে। আপনার ডায়মন্ড যেখানে ছিল সেখানেই আছে নিরাপদে। কফির বীজ নিয়ে চলে গেছে ইয়াকুব।'

এক মিনিট স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইল সবাই রানার মুখের দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বিলেতী কেতা ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন রানাকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। বহু কষ্টে ওঁর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হলো রানা। কমোডোর জুলফিকার ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, 'তোমার জন্যে আমি কেন, সমগ্র দেশ আজ গর্বিত, রানা। ভুলেও আর তোমাকে ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সে যোগ দিতে বলব না আমি। তোমার মত সিংহকে বশে রাখতে হলে দরকার সিংহ-হৃদয় রাহাত খানের।'

দুর্বল লাগছে রানার। শুয়ে পড়ল সে স্ট্রেচারে।

লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে হাঁটু গেড়ে বসল যোরা পাশে। রানার একটা হাত তুলে নিল হাতে।

'মাফ করবে না আমাকে, রানা?'

'না।' সাফ জবাব দিল রানা।

আঠারো

একা শুয়ে ভাবছে রানা।

সান্তা ক্রুজ লিসবনে পৌঁছতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে ওরা। কমোডোর জুলফিকার আর ক্যাপ্টেন আনসারী প্লেনে করে চলে গেছেন লন্ডনে চিকিৎসার জন্যে। নিরাপদে-মস্কো চলে গেছে ডক্টর নিকোলাই সেরভ। রানাকে যোরা আর ডাকু চাচা জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে ইস্তাম্বুলে। ইস্তাম্বুলের সেরা হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে ছিল সে তিন দিন। এরই মধ্যে নানান সূত্র থেকে নানান কথা জানতে পেরে নানান ধরনের লোক রানার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিতে আরম্ভ করায় রাহাত খানের বিশেষ নির্দেশ পেয়ে সরে এসেছে রানা বসফরাসের ধারে একটা চমৎকার ফার্নিশড় বাংলোয়। ফার্স্ট সেক্রেটারি আনিস চৌধুরীর বাংলো। অমায়িক ভদ্রলোক। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত সদাহাস্যময় চেহারা। অবিবাহিত। এক নজরে পছন্দ করল রানা সমবয়সী এই বাঙালী ভদ্রলোককে।

চৌধুরীকে দিয়েই হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল রানা দু'দিন আগে

এখনও উত্তর না আসায় সাত-পাঁচ ভাবছে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, আর অলস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে বসফরাসের দিকে। ছোট বড় হরেক রকম নৌকো ভেসে চলে যাচ্ছে রঙ-বেরঙের পাল তুলে। মাঝে মাঝে দ্রুত চলে যাচ্ছে যাত্রীবাহী মোটর লঞ্চ, হর্ন দিচ্ছে সামনে কোন নৌকো পড়লেই। ক্রমে কালচে হয়ে আসছে বসফরাসের ঢেউগুলো।

বিকেল মরে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। রানা ভাবছে অনেক কথা। জীবনের বিচিত্র সব ঘটনার কথা। কাজ সমাধা করে নিশ্চিন্তে আরোগ্যলাভ করেছে সে বরাবর। বহু সংঘাতময় অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর জীবনে– প্রতিবারই জয়ের মুকুট পেয়েছে সে। কিন্তু এবারের জয় সন্তুষ্টি আনতে পারেনি ওর মনে—বারবারই মনে হচ্ছে যেন গ্লানির কালিমা ছুঁয়ে যাচ্ছে ওর জয়ের গৌরবকে। সত্যিই কি জয়ী হতে পেরেছে সে? ইয়াকুবের ভালবাসায় কিন্তু কোনও খাদ ছিল না।

দুত্তোর বলে উঠে পড়ল রানা। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকল যোরা একরাশ ফুল নিয়ে।

'বাহ্! দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছ! ব্যান্ডেজ খুলে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজই সকালে খুলে দিয়ে গেছে।'

ফুলগুলো ফ্লাওয়ার ভাসে গুছিয়ে রেখে বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারে এসে বসল যোরা রানার পাশে। বেল বাজাতেই বেয়ারা এসে হাজির হলো।

'দু'কাপ কফি খাওয়াও দেখি, সেলাল,' বলল রানা বেয়ারাকে।

'আনছি, স্যার,' চলে গেল সে মাথা ঝাঁকিয়ে।

যোরা একটা হাত রাখল রানার হাতে। 'জানো রানা, কাল রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'কিসের দুঃস্বপ্ন?'

'সেই সব ঘটনাগুলোর। কি ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম! জীবনমরণ সমস্যা! এই তো ক'দিন আগের কথা, এখন বিশ্বাস হতে চায় না—মনে হয় অবাস্তব কোনও হরোর পিকচার দেখেছি।'

'আমার কিন্তু মনটা খুঁত-খুঁত করছে—জাহাজটা বাঁচাতে পারলাম না।'

'আশ্চর্য! এখনও জাহাজটার কথা ভাবছ তুমি? দু'শো আড়াইশো লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেইটাই বড় নয়? তুমি না থাকলে এতগুলো লোকের আজ কি অবস্থা হত?'

'ভাবছি, হেড অফিস হয়তো সেই কথাটা বুঝতে চাইবে না। হয়তো মনে করবে…'

'কিছুতেই না। দেখে নিয়ো তুমি। তাছাড়া ইনশিওরেন্সের জোরে একটা জাহাজের বদলে দুটো জাহাজ পাচ্ছে তোমার দেশ। সেটাই বা কি কম লাভ হলো? ভাল কথা, ডায়মন্ড করপোরেশনের পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পুরস্কারের চেকটা পেয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ। ওটা আবু তাহেরের স্ত্রীকে দিয়েছি।'

'পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড! এত টাকা…'

'টাকা তো বড় কথা নয়, যোরা। ও আমার বন্ধু ছিল। ওই টাকায় ওর তিন ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া হবে।'

বেয়ারা কফি নিয়ে এল। যত্নের সঙ্গে কাপ দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে থাকল।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'স্যার, একটা চিঠি আছে আপনার নামে। আনিস চৌধুরী সাহেব পাঠিয়েছেন।'

'দেখি?'

চিঠি নয়, হেড অফিসের মেসেজ।

'জাহাজের জন্যে দুঃখ কোরো না। তোমার কাজে আমি বিশেষ—রিপিট—বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। সাতদিন মেডিক্যাল এবং সাত দিন আর্নড লিভ অনুমোদন করা হলো। আর. কে.।'

হাসি ফুটল রানার মুখে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের দুইবার 'বিশেষ' কথাটা বলা মানে সাঙ্ঘাতিক! একবার বললেই ধন্য হয়ে যেত রানা। তার মানে খুবই খুশি হয়েছে বুড়ো। কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ একজোড়া চোখ ভেসে উঠল রানার মানসপটে। মেসেজটা বাড়িয়ে দিল সে যোরার দিকে।

'কি? বলেছিলাম না?' ঝিক করে হেসে উঠল যোরার চোখ মেসেজটা পড়েই।

কফি শেষ হতেই আরেকটা খাম নিয়ে উদয় হলো বেয়ারা।

'ওটা আবার কি, সেলাল?'

'এক্ষুণি দিয়ে গেল একজন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল, অনুমতি নেই শুনে খামটা দিয়েই চলে গেল।'

কেজিবি-চীফের লেখা একটা প্রশংসা-পত্র। হেড অফিসে পাঠিয়েছে ওরা আসলে চিঠিটা, রানাকে দিয়েছে একটা কপি।

'সোভিয়েট রিপাবলিকের তরফ থেকে পাকিস্তান কাউন্টার

ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মেজর মাসুদ রানার মাধ্যমে আমাদের দেশ যে উপকৃত হয়েছে সেকথা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব আমরা। দু'দেশের ক্রম-বর্ধমান বন্ধুত্ব আরও ঘনীভূত হোক।'

যোরাও পড়ল চিঠিটা। খালি কফির কাপ তুলে নিয়ে চলে গেল সেলাল।

'রানা,' ডাকল যোরা।

'বলো।' বসফরাসের দিক থেকে সরিয়ে এনে দৃষ্টি রাখল রানা যোরার চোখে।

'সত্যি করে বলো তো আমাকে মাফ করতে পেরেছ কিনা?'

'মাফ? তোমার অপরাধ?'

'ভুল বুঝেছিলাম আমি তোমাকে।'

'সে তো সবাই ভুল বুঝেছিল। ইচ্ছে করেই সবাইকে ভুল বুঝিয়েছিলাম আমি।'

'কিন্তু আমার তো এই ভুল করা উচিত হয়নি।'

'দেখো, মাফ করবার কথা বোলো না। কোহেনের হাত থেকে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। মনে আছে? তুমি কি বলতে চাও সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা উচিত? মোটেও নয়। আমাকে তখন না বাঁচালে পরে তোমাদের সবাইকে উদ্ধার করতাম কি করে আমি? কাজেই আমার কাছেও কেউ আসলে ঋণী নয়। সাতদিন আগে অদ্ভুত এক অবাস্তব জগতে স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম আমরা। সবাই আমরা যে যার কর্তব্য পালন করেছি। চুকে গেছে সবকিছু, ভুলে যাও।'

'তবে সেদিন যে বললে মাফ করবে না আমাকে?'

'মাফের প্রশ্নই ওঠে না, তাই বলেছিলাম ও কথা।'

হাসল যোরা। হাসিটা দেখতে পেল না রানা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না যোরার মুখ। কিন্তু ওর আন্তরিক কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো কৃতজ্ঞতা। 'ধন্যবাদ, রানা। বড় কষ্ট হচ্ছিল গত কয়েক দিন। গ্লানিবোধ থেকে মুক্তি পেলাম আজ। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

* * * *